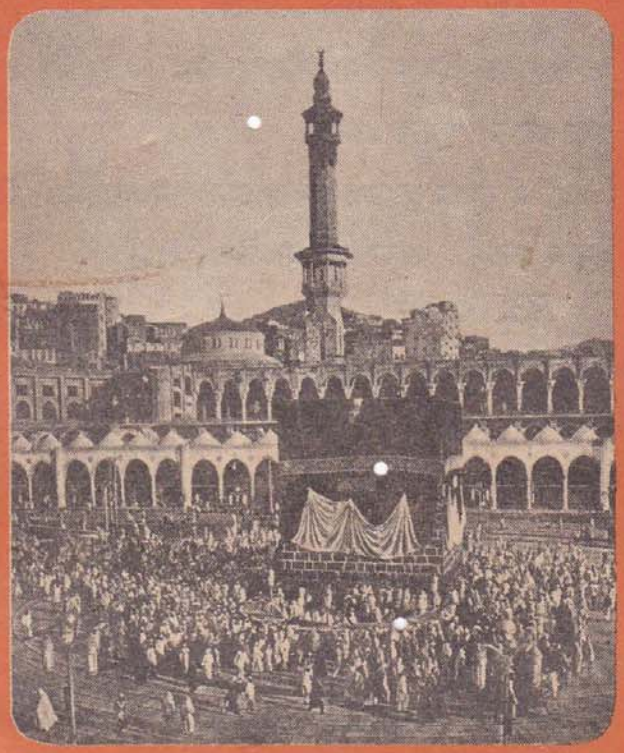

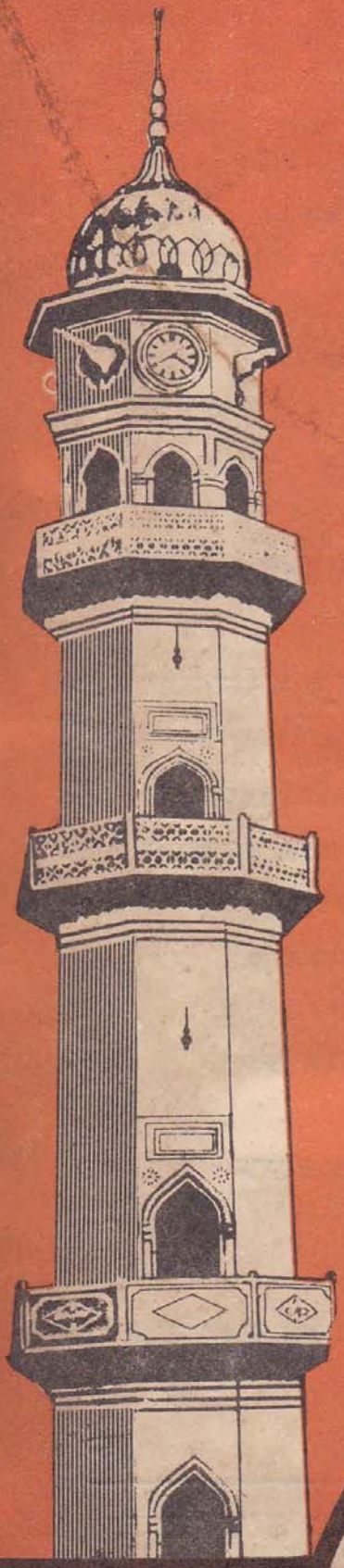

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৫৯ বর্ষ ॥ ১২শ সংখ্যা

১লা রমযান, ১৪১৮ হিঃ ॥ ১৭ই পৌষ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ ॥ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ॥ ভারত ৩ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ॥

সূচিপত্র

বিষয়		লেখক	পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন (তফসীর সহ)	:	'কুরআন মজীদ' থেকে	১
হাদীস শরীফ : রমযান	:	অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ	৩
অমৃত বাণী : হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	:	অনুবাদ :	
রোয়েদাদ জলসা দোয়া-পুস্তক থেকে		সাহেবুল কাহ্‌ফ	৪
হাকীকাতুল ওহী : মূল : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ	:	অনুবাদ :	
কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)		নাজির আহমদ ভুঁইয়া	৭
জুমুআর খুতবা	:	অনুবাদ :	
সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)		মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১১
মধ্যবর্তী নামাযের হেফযত	:	অনুবাদ :	
সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)		মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	১৩
ধর্মের পরিচয় ও এর প্রয়োজনীয়তা	:	অনুবাদ :	
হযরত মাওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব (রাঃ)		মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২১
খতমে নবুওয়ত ও আহমদীয়া জামাত	:	ভাষান্তর—এ, এইচ, এম আলী	
মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর, লায়েলপুরী		আনওয়ার (মরহুম)	২৬
পৃথিবীটা বড্ড পীড়িত	:	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৩১
কুরআনী জিন্দেগী	:	সংকলক : খোন্দকার আজমল হক	৩২
ছোটদের পাতা	:	পরিচালক : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৩৪
পত্র-পত্রিকা থেকে	:		৩৬
নামাযে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভের ব্যবস্থা	:	অনুবাদ :	
সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)		মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৩৭
কোন্‌টি সত্য ?	:	সাহেবুল কাহ্‌ফ	৪৬
সম্পাদকীয়	:		৪৯

* পূর্ব ঘোষণানুযায়ী পাক্ষিক আহমদীর বিশেষ সংখ্যা বের হবে জলসার সময়। তাই এতে যারা লেখা পাঠাতে চান তাদেরকে জানুয়ারী '৯৮ এর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে লেখা পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৯তম বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ : ৩১শে ফাতাহ্, ১৩৭৬ হিঃ শামসী : ১৭ই পৌষ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আল্ বাকারা—২

১৮৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ। তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হইল, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের (২০৬) উপর ইহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করিতে পার।

১৮৫। (ফরয রোযা) নির্দিষ্ট দিনগুলিতে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে, এবং যাহাদের পক্ষে ইহা (রোযা রাখা) ক্ষমতাতীত, (২০৭) তাহাদের উপর ফিদিয়া—একজন মিসকীনকে আহার্য দান করা। অতএব, যে কেহ স্বেচ্ছায় পুণ্যকর্ম করিবে, উহা অবশ্য তাহার জন্য উত্তম হইবে। আসলে তোমরা যদি জ্ঞান রাখ তাহা হইলে তোমাদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণ কর।

২০৬। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে রোযা (উপবাস-ব্রত) পালন কোনও না কোন আকারে সকল ধর্মেই পাওয়া যায়। "অধিকাংশ ধর্মগুলিতে এবং নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর কৃষ্টির মধ্যে, উপবাস ব্রত একটি সাধারণভাবে নির্দেশিত ব্যাপার। আর যেখানে এই ধরনের নির্দেশ নাই, সেখানেও প্রাকৃতিক প্রয়োজনের তাগিদে অনেকেই উপবাস করিয়া থাকেন" (এনসাই বৃট)। সাধুপুরুষ ও দিব্যজ্ঞানীগণের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মনের পবিত্রতা সাধনের জন্য শারীরিক সম্পর্কসমূহ কিছুটা ছিন্ন করা এবং সাংসারিক বন্ধন হইতে কতকটা মুক্তিলাভ একান্তই প্রয়োজন। তবে, ইসলাম এই উপবাস ব্রতের মধ্যে নবরূপ, নবঅর্থ ও নবতম আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরোপ করিয়াছে। ইসলাম রোযাকে (উপবাস পালন) পূর্ণমাত্রায় আত্মোৎসর্গস্বরূপ মনে করিয়া থাকে। ইহা আত্মবলিদানের প্রতীক। যিনি রোযা পালন করেন, তিনি যে কেবল শরীর রক্ষাকারী খাদ্য-পানীয় হইতেই

বিরত থাকেন তেমন নহে, বরং সন্তানাদি জন্মদান তথা বংশবৃদ্ধির ক্রিয়াকলাপ হইতেও দূরে থাকেন। অতএব, যিনি রোযা রাখেন, তিনি তাহার প্রস্তুতির কথা জানাইয়া দেন যে, প্রয়োজনবোধে, তাহার প্রভু সৃষ্টিকর্তার খাতিরে তিনি তাহার সবকিছু, এমন কি তাহার জীবন পর্যন্ত কুরবানী করিয়া দিতে সামান্যও কুণ্ঠিত নহেন।

২০৭। 'ইয়ুতিকুনাহু'র অর্থ করা হইয়াছে, যাহাদের পক্ষে ইহা ক্ষমতাতীত বা যাহারা অতিকষ্টে ইহা (রোযা) করিতে পারে। অন্য পাঠ 'ইয়ুতাঈকুনাহু' এই অর্থকে সমর্থন করে (জরীর)। এই আয়াতে তিন শ্রেণীর বিশ্বাসীকে রোযার ব্যাপারে কিছুটা রেহাই বা সুবিধা দেওয়া হইয়াছে—অসুস্থ, ভ্রমণরত এবং অতি দুর্বলদিগকে। 'ইয়ুতিকুনাহু'র অর্থ এখানে "যাহারা রোযা রাখিতে অসমর্থ" হইতে পারে (লিসান ও মুফরাদাত)। সমস্ত বাক্যটির অর্থ এইরূপও করা হইয়াছে, "রোযা রাখা ছাড়াও, অতিরিক্ত পুণ্য অর্জনের জন্য সামর্থ্যবান ও অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ" গরীবদিগকে খাওয়াইতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে 'ইয়ুতিকুনাহু'র 'হু' সর্বনামটি একজন গরীবকে "খাওয়ানোর" পরিবর্তে ব্যবহৃত হইবে।

(৩য় পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

হলো দিব্যদর্শনের দরজা তার জন্যে যেন এভাবে খুলে যেন সে খোদাকে দেখতে পারে।
(মলফুযাত ৪র্থ খণ্ড, ২৬৭ পৃঃ)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মলফুযাত হতে জানতে পারা যায়, রোযা হলো খোদাকে দেখার মাধ্যম। আর খোদাকে দেখতে হলে হৃদয়ের পবিত্রতার প্রয়োজন যা অর্জন করা রোযা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। তাই আসুন রোযার এই পবিত্র মাসে নিজেদের হৃদয়কে আলোকিত করে তুলি। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবাইকে ইহার তৌফীক দিন। (আমীন)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন:

اللهم مزقهم كل ممزق و سحقهم تسحيقا

لعنة الله على الكاذبين

(আল্লাহুম্মা মায্‌যিকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকিন ওয়া সাহ্‌হিক্‌হুম তাস্‌হীকা
লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ: হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত!

হাদিস শরীফ

রমযান

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন ঃ

شهر رمضان الذى انزل فيه القران

অর্থাৎ রমযান সেই মাস যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে অথবা রমযান সেই মাস যে মাস সম্বন্ধে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة و غلقت ابواب النار و صفدت الشياطين (بخارى)

হাদীস ঃ

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, যখন রমযানের মাস শুরু হয় তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় ও জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলা-বদ্ধ করা হয় (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ

রমযানের রোযা ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ রুকন (ভিত্তি)। প্রত্যেক বালেগ সুস্থ মুসলমান নর-নারীর উপর ইহা ফরয। হযরত রসূল করীম (সাঃ) সম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি এ মাসটির জন্য প্রস্তুতি নিতেন। তিনি (সাঃ) নিজ স্ত্রীদিগকে বলতেন, কোমর বেঁধে নাও। এই মাসের ফযিলত কুরআন হতে জানা যায় যে, মানব জাতির জন্যে শেষ শরীয়ত এ মাসে অবতীর্ণ হয়েছে আর ইহাও যে, এই মাসটি এত বরকতময় যে, এ মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

রমযান আমাদের হাতে কলমে শিক্ষা দিতে আসে যে, তোমরা নিজেদের সংশোধন কর। হাত পা মুখ ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য ছিদ্রসমূহের হিফাযত কর, খোদার জন্যে হয়ে যাও। খোদার জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অনাহারে থাকো। আর এভাবে তোমরা নিজেদের হৃদয়কে পবিত্র কর।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে, সূফীগণ হৃদয়কে আলোকিত করে তোলার জন্যে এ মাসটিকে উত্তম মাস বলে চিহ্নিত করেছেন। এ মাসে অনেক পর্দার উন্মোচন ঘটে। নামায হৃদয়কে পবিত্র করে এবং রোযা হৃদয়কে আলোকিত করে তুলে। হৃদয়কে পবিত্র করার অর্থ হলো অবাধ্য আত্মা হতে মুক্তি পাওয়া এবং হৃদয়কে আলোকিত করার অর্থ

(অবশিষ্টাংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

দোয়ার জলসার কার্য-বিবরণী

[ইহা ১৯০২ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ঘোষণানুযায়ী কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়]

(সপ্তম কিস্তি)

আমাদের নিজ গ্রামে যেখানে আমাদের মসজিদ রয়েছে এটা ছিলো সরকারী কর্মচারীদের জায়গা। ঐ সময়ে ছিলো আমাদের বাল্যকাল। কিন্তু আমি বিশ্বস্ত লোকদের নিকট থেকে শুনেছি যে, যখন ইংরেজদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো তখনও কয়েকদিন পর্যন্ত প্রাক্তন সরকারী আইন-কানুন চলছিলো। ঐসব দিনে একজন সরকারী কর্মকর্তা এখানে আসলেন। তার সাথে একজন মুসলমান সৈন্য ছিলো। তিনি মসজিদে আসলেন এবং মুয়ায্‌যিনকে আযান দিতে বল্লেন। মুয়ায্‌যিন আগের মত ভয়ে ভয়ে গুণ গুণ করে আযান দিলেন। সিপাহী জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি সর্বদা এ রকম করেই আযান দিয়ে থাকো'? মুয়ায্‌যিন বল্লেন, 'হ্যাঁ, এভাবেই দিয়ে থাকি।' সিপাহী বল্লেন, "না, ছাদের ওপরে গিয়ে খুব জোরে যত জোরে পারো আযান দাও"। মুয়ায্‌যিন ভয় পেতে লাগলেন। পরিশেষে, তিনি সিপাহীর কথা মত জোরে আযান দিলেন। এতে সমস্ত হিন্দু একত্রিত হয়ে গেলো এবং মোল্লাকে ধরে ফেল্লে। ঐ বেচারা খুবই ভয় পেল এই মনে করে যে, সরকারী কর্মকর্তা তাকে ফাঁসী দিবে। সিপাহী বল্লো, আমি তোমার সাথে আছি। শেষ পর্যন্ত কঠোর প্রাণের ছুড়ি মারতে উদ্যত ব্রাহ্মণ তাকে ধরে নিয়ে গেলো সরকারী কর্মকর্তার কাছে। আর বল্লো, মহারাজ, সে আমাদের সব ভ্রষ্ট করে দিয়েছে। সককারী কর্মকর্তা তো জানতেন যে, সরকার পরিবর্তন হয়েছে এবং এখন আর শিখ রাজত্ব নেই। কিন্তু একটু সংগোপনে জিজ্ঞেস করলেন, তুই উচ্চ স্বরে কেন আযান দিয়েছিস? সিপাহী সামনে এগিয়ে এসে বল্লো, সে দেয়নি, আমি আযান দিয়েছি। সরকারী কর্মকর্তা (ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করে) বল্লেন, কমবখ্‌ত! হৈ চৈ করছো কেন? লাহোরে তো এখন প্রকাশ্যভাবে গরু যবাই হচ্ছে আর তোমরা আযানকে বাধা দিচ্ছো? যাও, চুপ চাপ বসে থাকো গিয়ে। মোটকথা ইহা প্রকৃত ও সত্য কথা যা আমাদের অন্তর থেকে বের হয়, যে জাতি আমাদেরকে পচা কাদার নীচ থেকে

বের করে এনেছেন যদি আমরা তার অনুগ্রহের স্বীকার না করি তাহলে পরে আমাদের জন্যে কতই না অকৃতজ্ঞতা ও নিমক হারামীর কাজ হবে!

এতদ্ব্যতিরেকে পাঞ্জাবে মুর্খতা আছন্ন হয়েছিলো। কম্মে শাহ নামক এক বুড়ো লোক বর্ণনা করেছে যে, আমি আমার উস্তাদকে দেখেছি যে, তিনি বড়ই বিগলিত চিত্তে দোয়া করতেন যেন একবার **সহীহ বুখারীর** দর্শন লাভ হয়ে যায়। আর কখনও এ ধারণা করতেন যে, ইহা দর্শন কি সম্ভব! দোয়া করতে করতে এতই কাঁদতেন যে, তার হেঁচ্‌কি উঠে যেতো। এখন ঐ সহীহ বুখারী ২/৪ টাকায় অমৃতসর ও লাহোরে পাওয়া যায়। শের মুহাম্মদ সাহেব নামক একজন মৌলবী ছিলেন। কোথাও থেকে তিনি এহ্‌ইয়াউল উলুম পুস্তকের চারটি পাতা পেলেন। তিনি তা খুবই আনন্দ ও গর্বের সাথে বহু দিন পর্যন্তই প্রত্যেক নামাযের পরে নামাযীদের দেখিয়ে থাকতেন এবং বলতেন যে দেখ, ইহা এহ্‌ই-উলউলুম পুস্তক! আর আফসোস করতেন যে, কোথা থেকে পুরো বইখানা পাওয়া যায়। এখন এহ্‌ইয়াউল উলুম সকল স্থানে ছাপানো পাওয়া যাচ্ছে। মোটকথা ইংরেজদের আগমনের প্রসাদে লোকদের ধর্মীয় চক্ষুও খুলে গেছে। আর খোদাতা'লা ভাল করে অবহিত যে, এ রাজত্বের মাধ্যমে ধর্মের কতটা সাহায্য সমর্থন হয়েছে যে, অন্য কোন রাজত্বে তা সম্ভবই নয়। ছাপাখানার কল্যাণ ও নানা ধরনের কাজের উদ্ভাবনের দ্বারা প্রত্যেক প্রকার পুস্তক সামান্য সামান্য মূল্যে সহজলভ্য ছিলো। আবার ডাক বিভাগের অবদানে কোথা থেকে কোথা ঘরে বসে সব পাওয়া যেতো। আর এভাবে ধর্মের সত্যতার তবলীগের পথ কীভাবে সুগম ও সুস্পষ্ট হয়ে গেল। আবার ধর্মের ব্যাপারে অন্যান্য কল্যাণের যে সাহায্য সমর্থন এ সরকারের রাজত্বে পাওয়া গেল তার মধ্যে ইহাও একটি যে, বুদ্ধি-ভিত্তিক শক্তি ও মেধাগত সামর্থ্যে বড়ই উন্নতি সাধিত হলো। এবং যেহেতু সরকার প্রত্যেক জাতিকে নিজেদের ধর্মের প্রচারের স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে এজন্য সকল দিক থেকে লোকদের প্রত্যেক ধর্মের রীতি-নীতি ও দলীল-প্রমাণ পরখ করার এবং এসবের ব্যাপারে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়ার সুযোগ লাভ হোল। ইসলামের ওপরে যখন বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীগণ আক্রমণ করে তখন ইসলামের অনুসারীগণের সাহায্য সমর্থন ও সত্যতার জন্যে নিজেদের পুস্তকাদির ওপরে গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ এসে গেল এবং তাদের বুদ্ধি-ভিত্তিক শক্তি উন্নতি লাভ করলো।

ইহা নিয়মের কথা যে, যেভাবে দৈহিক-শক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়—বিকাশ লাভ করে, ঘোড়া যেভাবে সওয়ারের চাবুকের আঘাতে সঠিকভাবে চলে তেমনি ইংরেজদের আগমনে ধর্মের নিয়ম-নীতির ওপরে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ এসে গেল। আর নিজের সত্য-ধর্মের মধ্যে চিন্তাশীলগণের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব লাভ হলো। আবার **কুরআন করীমের** বিরুদ্ধবাদীগণ যে যে স্থানে আপত্তি তুলো সেখান থেকেই চিন্তাশীলগণের একটি

তত্ত্বজ্ঞানের ভাণ্ডার লাভ হলো। আর ঐ স্বাধীনতার কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞানও প্রভূত উন্নতি লাভ করলো। এবং এ উন্নতি বিশেষভাবে এখানেই হয়েছে। এখন তুরস্ক বা সিরিয়ার কোন অধিবাসী, হোকনা তারা যতই আলেম ফাযেল যদি এসে যায় তাহলে তারা খৃষ্টানদের বা আর্য সমাজীদের আপত্তিসমূহের সুষ্ঠু জবাব দিতে পারবে না। কেননা, তাদের এরূপ স্বাধীনতা ও খোলা-খুলিভাবে বিভিন্ন ধর্মের নিয়ম-নীতি তুলনামূলক চর্চার সুযোগ ঘটেনি। মোটকথা যেভাবে বাহ্যিকভাবে ইংরেজ সরকারের দ্বারা দেশে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় তেমনি আধ্যাত্মিক নিরাপত্তাও পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু আমাদের সম্পর্ক ধর্মের সাথে ও আধ্যাত্মিকতার সাথে তাই আমরা অধিকতর ঐ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবো যা কিনা ধর্মীয় অনুশাসনাদি প্রতিপালনে সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়। সুতরাং স্মরণ রাখা উচিত যে, মানুষ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও প্রশান্তির সাথে ইবাদত বন্দেগী তখনই করতে সক্ষম হয় যখন এর মধ্যে চারটি শর্ত নিহিত থাকে। আর এগুলো হলো:

প্রথম হলো সুস্বাস্থ্য:

যদি কোন ব্যক্তি এমন দুর্বল হয় যে, বিছানা থেকে উঠতে পারে না সেক্ষেত্রে সে কীভাবে নামায রোযার অনুশাসন পালন করতে পারে। পুনরায় সে এ ভাবেই হজ্জ-যাকাত প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পালনের ক্ষেত্রে পিছনে পড়ে থাকবে। এখন দেখা উচিত যে, সরকারের মধ্যস্থতায় আমাদের শরীর স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার জন্যে কী পরিমাণ দ্রব্যাদি লাভ হোল। প্রত্যেক বড় শহরে ও ছোট শহরে হাসপাতাল অবশ্যই আছে যেখানে রুগীদের চিকিৎসা খুবই স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ও সহানুভূতির সাথে করা হয়। আর ঔষধ-পথ্যাদি বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। কতক হাসপাতালে রেখে এমনভাবে তাদের দৃষ্টিপটে রেখেও সেবা-শুশ্রূষা করা হয় যে, কেউ নিজের ঘরেও এমন সহজে ও স্বাচ্ছন্দ্যে ও আরামের সাথে চিকিৎসা করাতে পারে না। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে একটি আলাদা বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ওপরে সারা বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। ছোট ও বড় শহরগুলোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্যে বড় বড় জিনিষ-পত্র সরবরাহ করা হয়। দুর্গন্ধ-পানি ও স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকারক নোংরা-ময়লা দ্রব্যাদি বিনষ্ট করার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। আবার প্রত্যেক প্রকারের প্রভাবশীল ঔষধ-পত্র তৈরী করে খুব কম মূল্যে সরবরাহ করা হয়; এমন কি প্রত্যেক ব্যক্তি কিছু ঔষধ-পত্র নিজের ঘরে রেখেও প্রয়োজনের সময়ে চিকিৎসা করাতে পারে। বড় বড় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে চিকিৎসা বিদ্যার প্রসারতা ঘটানো হয়েছে। এমনকি গ্রামেও ডাক্তার পাওয়া যায়। কতিপয় মারাত্মক ব্যাধি যেমন বসন্ত, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি নিরাময়ের জন্যে ইদানিং কালে প্লেগের ব্যাপারে যেভাবে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থাদি নেয়া হয়েছে তা খুবই প্রশংসার দাবী রাখে। মোট কথা স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সরকার সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করেছে। আর এমনিভাবে ইবাদত-বন্দেগী করার জন্যে প্রথম প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণার্থে অনেক সহযোগিতা করেছে।

(চলবে)

('রোয়েদাদ জলসা দোয়া' পুস্তক থেকে অনূদিত—সাহেবুল কাহফ)

হাকীকাতুল ওহী

[মূলঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী]

ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভুঁইয়া

(১১তম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

চিঠি-পত্রের বিবরণ, যাহা ২৫ (পঁচিশতম) দিন সম্পর্কে সাক্ষ্যরূপে পাওয়া গিয়াছে (যাহা একটি ভীতিপ্রদ ও আশ্চর্যজনক আকাশের গোলার নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া সম্পর্কিত ছিল, এবং যাহা ১৯০৭ সালের ৩১শে মার্চে আসরের সময় প্রকাশিত হইল)।

ক্রমিক নম্বর	চিঠি প্রেরণের তারিখ	প্রেরকের নাম	মৌজার নাম	তহসিলের নাম	জেলা নাম	চিঠির বিষয়-বস্তুর সার-সংক্ষেপ
১।	৩১শে মার্চ, ১৯০৭	সৈয়্যদ আহমদ আলী শাহ্ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর	মালুমুহী	পসরুর	সিয়ালকোট	আজ সময় সন্ধ্যা ৪ ঘটিকা তারিখ ৩১শে মার্চ, ১৯০৭ সাল আসমানী নিদর্শন দেখিলাম, যাহা সারা জীবনে দেখি নাই, দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিকে ছোট আগুনের টুকরা মনে হইতেছিল। ইহা প্রায় দুই বর্গফুট ছিল এবং যমীন হইতে পৌণে এক মাইল উচুঁতে ছিল। উহার পিছনে সবুজ লাল ও গোলাপী রঙের লেজ ছিল। উহা ছিল ধুঁয়ার ন্যায়। ঐ লেজ মেঘের রঙ ধারণ করিয়া ছোট হইয়া যাইতেছিল এবং বৃষ্টির ন্যায় উহার তীব্র আওয়াজ শুনা যাইতেছিল। এই আগুন নারী-পুরুষ হিন্দু-খৃষ্টান-মুসলমান প্রভৃতি সকলেই দেখিল। উহা গ্রামের নিকট উত্তর দিকে দুই মাইল গেল। উহা হইতে দুইটি তোপের আওয়াজের সমান আওয়াজ বা দুইটি গোলার ন্যায় আওয়াজ আসিল। অতঃপর দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। হুযূরের ২৫ (পঁচিশতম) দিন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা ৭ই মার্চ করা হইয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইয়া গেল। কেননা, ৩১শে মার্চ এই আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখা গিয়াছিল।
২।		সৈয়্যদ আবদুস সাত্তার শাহ্ হসপিটাল এ্যাসিষ্টান্ট	রা'ইয়া		সিয়ালকোট	রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে চার ঘটিকার সময় একটি আসমানী নিদর্শন অর্থাৎ বৃহদাকার অগ্নি দেখা গেল। ইহা দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া উত্তর দিকে যাইতেছিল। ইহা আমাদের গৃহ সংলগ্ন গাছপালার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিল।

ক্রমিক নম্বর	চিঠি প্রেরণের তারিখ	প্রেরকের নাম	সাকিন	জেলা	চিঠির বিষয়-বস্তুর সার সংক্ষেপ

ইহাকে প্রায় সোয়া গজ লম্বা আগুনের ন্যায় চমকানো ভয়ানক ভীতিপ্রদরূপে দেখা গেল। মহিলারা দেখিয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেল। বৃক্ষরাজির উপর ইহার উজ্জ্বলতা ছিল সাদা রং এর এবং আমাদের দিকে ইহা ছিল আগুনের ন্যায়। ইহা অকস্মাৎ মেঘের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সাদা হইয়া গেল। অতঃপর ধীরে ধীরে অনেক উচ্চতায় চলিয়া গেল। সোমবার দিন দূর দূরান্ত হইতে সংবাদ আসিল যে, বহু লোক ইহাকে ভয়ংকর ভীতিপ্রদরূপে দেখিয়াছিল। এমনকি একটি গ্রামে অনেক লোক বেহুশ হইয়া গেল এবং তাহাদের মুখে পানি ঢালা হইল। তখন তাহারা হুশে আসিল। যে যে গ্রামে ইহা দেখা গিয়াছে তাহাদের সকলের নিকট ইহাই মনে হইয়াছে যে, তাহাদের নিকটেই ইহা পড়িয়াছে। ২৫দিন সম্পর্কিত ইলহাম পূর্ণ হইল, যাহাতে লেখা ছিল যে, ৭ই মার্চ হইতে ২৫ (পঁচিশ) দিন পর্যন্ত বা পঁচিশতম দিনে কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রকাশিত হইবে।

৩।	১৯০৭ সাল ৩১শে মার্চ	উমর উদ্দীন চৌধুরী	মিয়ান ওয়ালী	সিয়ালকোট	৭ই মার্চ ১৯০৭ সাল সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী, যাহার প্রকাশের জন্য

২৫ (পঁচিশ) দিন বা পঁচিশতম দিন পর্যন্ত শর্ত দেওয়া হইয়াছিল এবং যাহাতে লেখা ছিল যে, ঐ ঘটনা আশর্যজনক ও ভীতিপ্রদ হইবে, তাহা আজ আল্লাহ্‌তা'আলার ফযলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কয়েকজন ভ্রাতা অর্থাৎ জিয়ান মাতবর, চাষী ফযল এলাহী, চাষী আলী বকস ও আরো কয়েকজন বন্ধুবান্ধবসহ খাকসার মসজিদের পাশে বসিয়া দেখিতেছিলাম। সময় ছিল আসরের নামাযের শুরু। আকাশ হইতে আতশবাজির গোলার সমান একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ আমাদের মৌজা হইতে পূর্ব ও উত্তরে পতিত হইল। আগুনের তেজ এত ছিল যে, যাহারা দেখিল তাহারা চোখে হাত রাখিল। একটি ধূম্রধারা আকাশে অল্পক্ষণ অবস্থান করিল। এই ভীতিপ্রদ ও আশ্চজনক ঘটনা দেখিয়া নারী-পুরুষ সকলে হতবাক হইয়া গিয়াছিল। খোদাওয়ান্দ করীম তাঁহার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের নিকট যে সংবাদ প্রকাশ করেন তাহা যথাসময়ে পূর্ণ হইয়া যায়।

৪।	৩১শে মার্চ ১৯০৭ সাল	এনায়েত উল্লাহ রঙমিস্ত্রী	চৌবিন্দা	সিয়ালকোট	আপনাকে মোবারকবাদ জানাই। খোদার নিদর্শন, যাহা ৭ই মার্চ হইতে পঁচিশতম দিন পর্যন্ত পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল, তাহা প্রকাশিত

হইয়াছে। ৩১শে মার্চ দিনের চারটার সময় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ বর্ণনা করিয়াছে যে, আকাশে একটি অগ্নিপিণ্ড খুব আলোকোজ্জল হইয়া দেখা দিল। অতঃপর উহা দেখিতে দেখিতেই

ধুঁয়া হইয়া গেল। অতঃপর উহা বৃষ্টিতে পরিণত হইয়া নামিল। গংগারাম অরোড়া, দীননাথ, বাগা খতরী, ঠাকুরদাস, রহিম বক্স নিলারী, চৌবিন্দা পোষ্ট অফিসের মুন্সী, আব্দুল্লাহ ঠিকাদার এবং নিজে উহাকে ধুঁয়ার আকারে নামিতে দেখিলাম। আমার পিয়ন রামও দেখিয়াছে।

৫।	১লা এপ্রিল ১৯০৭ সাল	নবীবক্স পিতা ভোলাশাহ্ ফকির	ঐ	হুবহু হুযূরের ভবিষ্যবাণী অনুযায়ী ৩১শে মার্চ ১৯০৭ সাল রবিবার দিন বেলা চার ঘটিকার সময় একটি স্ফুলিংগ, যাহা আগুনের স্ফুলিংগ বলিয়া মনে হইতেছিল, পশ্চিম দিক হইতে বাহির হইয়া পূর্বদিকে যাইয়া অদৃশ্য হইল। উহা প্রায় দুই গজ লম্বা ছিল। উহার তিনটি রঙ ছিল—লাল, সবুজ ও হলুদ। অদৃশ্য হওয়ার পর একটি বড় ধুম্র দেখা দিল। তোপের ন্যায় আওয়াজও শুনা গিয়াছে।
৬।	ঐ	বরকত আলী সেক্রেটারী মিউনিসিপ্যাল কমিটি	কেল্লা সুব্হা সিং	ঐ কাল প্রায় পাঁচটার সময় একটি আসমানী রহস্য দেখা গিয়াছে। দূর দূরান্তেও এই খবর বিস্তার লাভ করিয়া থাকিবে। ইহা একটি আসমানী নিদর্শন। খোদাতা'আলার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ২৫ দিনের মধ্যে ইহা প্রকাশিত হইল। কেননা, ৭ই মার্চ, ১৯০৭ সালে যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন হইতে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ২৫ দিন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অতএব ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই আশ্চর্যজনক ঘটনা ৩১শে মার্চে প্রকাশিত হইল। আলহামদুলিল্লাহ্।
৭।	ঐ	মোহাম্মদ আলী শাহ সৈয়্যদ শিক্ষক	সিদানওয়ালী	ঐ ৩১শে মার্চ প্রায় ৫টার সময় একটি ভীতিপ্রদ অগ্নি স্ফুলিংগ দ্রুতগতিতে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে যাইতে দেখা গিয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ্। ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গেল যাহাতে লেখা যে, ৭ই মার্চ ১৯০৭ সাল হইতে পঁচিশ দিন পর্যন্ত বা পঁচিশতম দিনে কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রকাশিত হইবে।
৮।	ঐ	মোহাম্মদ আল্ দীন আপীল নবীশ	সিয়ালকোট	ঐ গতকাল প্রায় সাড়ে তিন ঘটিকার সময় আকাশ হইতে স্ফুলিংগ নামিয়া আসিতে দেখা গেল। যমীন ও আসমানের মধ্যে একটি স্তম্ভ অনেকক্ষণ দেখা গেল। খোদা ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিলেন যাহাতে লেখা ছিল যে, ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বা মার্চের একত্রিশতম দিনে কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রকাশিত হইবে।

ক্রমিক নম্বর	চিঠি প্রেরণের তারিখ	প্রেরকের নাম	সাকিন	জেলা	চিঠির বিষয়-বস্তুর সার-সংক্ষেপ
৯।	ঐ	সৈয়্যদ মোহাম্মদ রশীদ ক্লার্ক মহকমা নম্বর	ঐ	ঐ	কাল আসরের সময় উল্কাপাত হইল। খোদা ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিলেন যেখানে বলা হইয়াছিল যে, নিশ্চয় ৩১শে মার্চে বা ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রকাশিত হইবে।
১০।	ঐ	মোহাম্মদ ফসলিকে রমযান	গুজরাত		অগ্নি-স্ফুলিংগ দ্বারা ৩১শে মার্চ সম্পর্কি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল।
১১।	ঐ	আতা এলাহী বাবু মুসা	লালা	ঐ	আশ্চর্যজনক ঘটনা আসমানী স্ফুলিংগ ৩১শে মার্চ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়া দিল।
১২।	৩১শে মার্চ ১৯০৭ সাল	মিয়া সাহাবুদ্দীন মসজিদের ইমাম	তেহাল	ঐ	৩১শে মার্চ ১৯০৭ সাল বেলা প্রায় চার ঘটিকার সময় আপনার ইলহাম অনুযায়ী একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রকাশিত হইল, অর্থাৎ আকাশে একটি অগ্নি স্ফুলিংগ দেখা গেল। ইহা দেখিয়াই হাজার হাজার মানুষ অবাক হইয়া গেল।
১৩।	১লা এপ্রিল ১৯০৭ সাল	করমদীন শিক্ষক	ডুঙ্গা	ঐ	খাস ডুঙ্গা ও নওয়া ডুঙ্গায় একটি অগ্নি স্ফুলিংগ মাটিতে পড়িল। আকাশে স্ফুলিংগের গতি ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর-পুর্ব দিকে। এই ঘটনা ৩১শে মার্চের। ইহা দ্বারা হুযূরের ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়া গেল। কেননা, ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীর মেয়াদ ছিল।
১৪।	ঐ	মোহাম্মদ ফযলুর রহমান	হিলান	ঐ	৩১শে মার্চ সন্ধ্যা চারটায় কয়েকটি আগুনের গোলা খুবই আলোকোজ্জ্বল রূপে আকাশ হইতে যমীনের দিকে নামিয়া আসিতে দেখা গেল। উহা মানুষের মাথার সমান উঁচু ছিল এবং দুই বা আড়াই গজ উহার লেজ ছিল। ইহা খুবই ভীতিপ্রদ ও আশ্চর্যজনক দৃশ্য ছিল। মানুষ ভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেল এবং অনেকেই বেহুঁশ হইয়া গেল। তাহারা অনেক পরে হুঁশে আসিল। ইহা দ্বারা হুযূরের ভবিষ্যদ্বাণী সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

জুমআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)

(সংক্ষিপ্তাকারে)

অনুবাদ—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

নামায, হজ্জ এবং রোযা এ তিনটি বিষয়ই দৃষ্টিপটে রেখে ভবিষ্যত প্রজন্মকে তরবীয়তের চেষ্টা করুন।

শৈশব থেকেই তাদের অন্তরে খোদার ভালবাসার বীজ বপন করুন।

লণ্ডন, ১৭ই জানুয়ারী '৯৭ : সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহের রাবে' আইয়্যাদাহুল্লাহুতা'অলা বেনাসরিহিল আযীয আজ মসজিদে ফযল লণ্ডনে খুতবা জুমুআ প্রদান করেন। তাশাহ্হুদ তাআওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠ করার পরে হুযূর (আইঃ) সূরাতুল বাকারার ১৮৪ ও ১৮৫ আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং বলেন যে, এসব আয়াতে রমযানের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কথা-বার্তা বলা হয়েছে। এগুলো সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। হুযূর (আইঃ) বলেন যে, বর্তমানে আমার দৃষ্টি ভবিষ্যত প্রজন্মের তরবীয়তের ওপরে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সহজ সরল কথায় রমযানের কল্যাণসমূহ লাভ করার পদ্ধতি শিখাচ্ছি। হুযূর (আইঃ) বলেন যে, নামায, হজ্জ এবং রোযা এ তিনটি হলো ইবাদতের মৌলিক বিষয় যার সম্পর্ক রয়েছে প্রত্যেক ধর্মের সাথে। (হজ্জের সম্পর্ক খোদার এমন পুণ্যবান বান্দাদের সাথে যাঁরা তাঁদের ধর্মকে খোদার জন্যে বিশেষভাবে নির্ধারিত করেছিলেন এবং কোন একটি স্থানে হয় তারা ধর্ণা দিয়ে বসে আছেন বা বারে বারে সেখানে আসতে থাকেন এবং ঐ স্থানের সাথে খোদার ইবাদতের সম্পর্ক এমন আত্মীয়তায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে যা ভঙ্গ করা যেতে পারে না।) যখন কোন স্থানের এমন মর্যাদা লাভ হয়ে যায় তখন উহাকে হজ্জের জন্যে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে আর প্রত্যেক জাতির জন্যে খোদাতা'আলা পৃথক পৃথক স্থান নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু সবার জন্যে সম্মিলিতভাবে খানা কা'বাকে মনোনীত করেছেন। আর উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিলো ঐ বারীতা'আলার একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা যা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এজন্যে খানা কা'বাকে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে সারা বিশ্বের একত্রিত হওয়ার স্থান বলা হয় নি, অথচ প্রারম্ভকাল থেকে ইহাই উদ্দেশ্য ছিলো।

হুযূর (আইঃ) বলেন, দ্বিতীয় ইবাদত হলো নামায। ইহা প্রত্যেক ধর্মে বিভিন্ন রঙ্গে বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। তৃতীয় বিষয় হলো রোযা। আল্লাহ্ তা'আলা রোযাকে ইসলামের পূর্বের অন্য সকল ধর্মে কোন না কোন আকারে অবশ্য করণীয় বলে নির্ধারিত করেছেন।

হুযূর (আইঃ) বলেন যে, এ তিনটি ইবাদতের প্রকারভেদকে দৃষ্টিপটে রেখে রমযান অতিবাহিত করা প্রয়োজন। খানা কা'বাকে সারা দুনিয়ার কেন্দ্রস্থল বানানোর সাথে যতটা সম্পর্ক এজন্যে দোয়া করা যেতে পারে। এদিক থেকে আমরা এক সীমা পর্যন্ত হজ্জের উদ্দেশ্যাবলী লাভ করবো যদি এ দিকে মানবমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে দোয়া করি।

হুযূর (আইঃ) বলেন যে, **এ তিনটি দিক রয়েছে যেগুলোকে দৃষ্টিপটে রেখে ভবিষ্যত প্রজন্মের তরবীয়তের চেষ্টা করুন।** তাদেরকে বলুন যে, ইবাদত ব্যতিরেকে তোমাদের জীবন একবারেই ব্যর্থ। এ অন্তর্দৃষ্টিকে জাগ্রত করতে হবে আর রমযান এজন্যে বড়ই উপযুক্ত মাস। **শৈশব থেকেই তাদের অন্তরে খোদার ভালবাসার বীজ বপন** করুন। প্রত্যহ তাদের পুণ্য কথা-বার্তা বলে এমনভাবে পানি সিঞ্চন করা দরকার যেন ক্রমে ক্রমে উহা পবিত্র বৃক্ষের আকৃতি ধারণ করে। হুযূর (আইঃ) বলেন, আমি ঐসব কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখছি যা পবিত্র রমযানে বিশেষভাবে ভীড় জমিয়ে আবির্ভূত হয়। এদিকে দৃষ্টি দাও এবং অধিক থেকে অধিকতর কল্যাণরাজি লুটে নাও।

হুযূর (আইঃ) বলেন যে, রমযানের উদ্দেশ্য খেলা-তামাশা করা নয়। এর একটি উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা তাকওয়া ও খোদা-ভীতিতে বুৎপত্তি অর্জন করো। প্রত্যেক রমযান যেন তোমাদের খোদার অধিকতর নিকটবর্তী করে দেয়, আর ইহা গণনার কয়েকটি দিনই-তো মাত্র এবং গোটা জীবনের কল্যাণরাজি এর সাথে সম্পৃক্ত। হুযূর (আইঃ) কুরআনের আয়াতের বরাতে বলেন যে, যেসব লোক রোযা রাখার শক্তি রাখে না তাদের ফিদিয়াস্বরূপ মিসকীনদের খাদ্য প্রদানের পুণ্য কাজ বেশী বেশী করা দরকার। গরীবদের দুঃখে অংশ নেয়া, তাদের প্রয়োজন পুরো করা এসব বিষয়-বস্তু রোযার উদ্ধৃতি মূলে খুবই সার্থকতার সাথে শিশুদের বুঝান যেতে পারে।

হুযূর (আইঃ) ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশগুলোর বরাত দিয়ে বলেন, এখানে সাধারণভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এমন সব গরীব লোকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয় না যারা খাদ্যের প্রত্যাশী। কিন্তু যেসব গরীব দেশ রয়েছে সেখানে ফিদিয়া পাঠান যেতে পারে। হুযূর (আইঃ) কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উহার বিভিন্ন ভঙ্গিকে সহজ ভাষায় বুঝান। হুযূর (আইঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হাদীসসমূহ উদ্ধৃত করেও রোযার গুরুত্ব ও উহার কল্যাণরাজি বর্ণনা করেন। এভাবে ইফতারীর ব্যাপারে, যা কোন কোন স্থানে লোক দেখানো কাজের রূপ নেয়। এ প্রসঙ্গেও তিনি উপদেশ দেন যে, এ বিষয়ও রোযার উদ্দেশ্যাবলীর পরিপন্থী। আর কখনও কখনও ইফতার পার্টির এমনসব আয়োজন করা হয় যে, লোকদের নামায ও যিক্‌রে ইলাহীর ও খেয়াল থাকে না। এজন্যে রমযানে এমন সব কর্ম রমযানের উদ্দেশ্যাবলীর পরিপন্থী। **প্রকৃত মজলিস উহাই যা যিকরে ইলাহীতে ভরপুর** আর ইফতারীর মজলিসকে আমি কখনও যিকরে ইলাহীর মজলিসে পরিণত হতে দেখি নি।

(আল্‌ ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর সৌজন্যে)

মধ্যবর্তী নামাযের হিফাযত

সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)
প্রদত্ত জুমুআর খোৎবা, ১৭ই অক্টোবর, ১৯৯৭ইং, মসজিদে ফযল, লণ্ডন]

তাশাহ্হুদ ও তায়াওউয্ এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করার পর হুযুর (আঃ) সূরা বাকারার ২৩৯ আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٩﴾

অতঃপর হুযূর বলেন – এই সেই আয়াত যার বিষয়-বস্তু সম্পর্কে আমি পূর্ববর্তী কয়েকটি খুৎবাতে আলোকপাত করেছি এবং বলেছি যে, এই বিষয়-বস্তু ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে। حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ সকল নামাযেরই হিফাযত কর; ইহা একটি মৌলিক আদেশ। الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى কিন্তু মধ্যবর্তী নামাযকে বিশেষভাবে স্মরণ রেখো অর্থাৎ হিফাযতের গুরুত্বের ক্ষেত্রে সকল নামাযেরই হিফাযত সমানভাবে গুরুত্ববহ; কিন্তু মৌলিক কর্তব্য হিসেবে বিশেষভাবে যে নামাযটির হিফাযত করার নির্দেশ রয়েছে উহা সেই নামায যাকে الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى বলা হয়েছে অর্থাৎ মধ্যবর্তী নামায যা কাজের মধ্যে চলে আসে। এই ব্যাপারে আমি পূর্বে কিছু কথা বলেছি এখন আরো কিছু কথা বলতে চাই। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নামায সম্পর্কে সাধারণভাবে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, (হাদীসটি কিতাবু মাওয়াকুতুস্ সালাত, বুখারী শরীফ হতে গ্রহণ করা হয়েছে), হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে ইহা বলতে শুনেছি, "তোমরা কি বুঝতে পার যে, যদি কারো ঘরের দরজার নিকট দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত হতে থাকে আর সে প্রত্যহ সেই নদ-নদীতে পাঁচবার গোসল করে তা হলে তার দেহে কোন ময়লা থাকতে পারে? সাহাবা (রাঃ) বল্লেন, হে আল্লাহ্র রসূল! কোন ময়লা থাকতে পারে না। হুযূর (সাঃ) বল্লেন, এই দৃষ্টান্তই পাঁচটি নামাযের; আল্লাহ্তাআলা এগুলি দ্বারা পাপ ক্ষমা করেন এবং তোমাদিগকে পবিত্রতা দান করেন। এই হাদীসের কিছু কথা ব্যাখাসাপেক্ষ এবং এ ব্যাপারে চিন্তা করার অবকাশ আছে। প্রথমতঃ যদি এখানে ঘরে পড়ার নামায সম্পর্কে বলা উদ্দেশ্য হতো তাহলে তার ওপরে এই দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য হয় না, যার ঘরের নিকট দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত এবং পাঁচবার সে উহাতে ডুব মেরে গোসল করতে থাকে। আমার দৃষ্টিতে প্রথমতঃ ইহাতে এই উদ্দেশ্য নিহিত আছে যে, নামায বাজমাতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এমন এক ব্যক্তি যার নিকটে মসজিদ রয়েছে সেখানে গিয়ে সে যদি পাঁচ ওয়াক্ত আধ্যাত্মিক ডুব দেয় ও মসজিদে বাজমাতে নামায পড়ে আধ্যাত্মিক দেহকে গোসলের মাধ্যমে পবিত্র করে সেই ব্যক্তির দেহে কি কোন ময়লা থাকতে পারে? যদি এই দৃষ্টান্তকে নামায বাজমাতের উপর প্রযোজ্য না করা হয় তাহলে এই ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে যে, গৃহে কোন্ নদী প্রবাহিত হয়; আর গোসল যে গৃহের ভিতরেই করে তাহলে বলতে হতো যে, ঘরের ভিতরেই নদী প্রবাহিত হচ্ছে। আসলে রেওয়ায়াত বর্ণনাকারী কোন কোন সময় ঐ রেওয়ায়াতের কোন এক অংশের শব্দ কিছু ভুলে যান; এখন রেওয়ায়াতের বিষয়-বস্তু এক দিকে ইঙ্গিত করতে থাকে আর অপর অংশ অন্য দিকে ইঙ্গিত করতে থাকে। এই রেওয়ায়াতের প্রথম অংশ তো পরিষ্কারই। ইহাতে কোন সন্দেহ নেই, যদি কোন গৃহের নিকট দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় এবং সে গৃহ হতে বের হয়ে সেই নদীতে নামে এবং উহাতে ডুব দিয়ে গোসল করে, তাহলে এমন ব্যক্তি কে যে আনন্দ অনুভব করতে পারে এবং তার দেহ হতে দাগ ধৌত হতে পারে? এ কাজটি অবশ্যই তাকে সর্বদা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে রাখবে এবং তার দেহ সব সময়ই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। ইহা সেই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের দিকে ইঙ্গিত করছে যা কেবল মসজিদে গিয়েই লাভ করা যায়।

ইহার পরক্ষণেই বলেছেন যে, এই দৃষ্টান্তই হলো পাঁচটি নামাযের। ইহা দ্বারা এই উদ্দেশ্যই ছিল, অথবা হয়তো রাবীর দ্বারা কিছু ভুল হয়েছে অথবা নবী করীম (সাঃ) এই আশা করেছেন যে, লোক নিজেই বুঝে নিবে যে, ইহা দ্বারা কী বুঝাচ্ছে। এই দৃষ্টান্তই পাঁচটি বাজমাত নামাযের। যদি বাজমাতের শব্দ ইহাতে সন্নিবেশ করে নেন অথবা সন্নিবেশিত মনে করে নেন তা হলে বিষয়টি সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এই দিক দিয়ে যখন আমি আরো চিন্তা-ভাবনা করলাম তখন জানতে পারলাম যে, হযরত আকদস রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিজের ঘর মসজিদের নিকটে ছিল এবং সেই সব গুরত্বপূর্ণ নামায যেগুলিতে মহিলাগণও জমাতে শামিল হতে পারতেন, যেমন জুমুআর নামায অথবা ভোরের নামাযের সময় আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সালামের সম্ভ্রান্ত ও পবিত্র মহিলাগণ গৃহে বসে বাজমাত নামায পড়তেন না, বরং মসজিদে এসে পড়তেন। জুমুআর সময়ও এইরূপ ব্যবস্থা ছিল যে, তাদের

জন্য পৃথক স্থান নির্ধারিত ছিল যেখানে তারা নির্দ্বিধায় ও নিঃসঙ্কোচে নামায পড়তেন। যেহেতু তারা পিছনে বসতেন এইজন্য তাদের উপর পুরুষদের দৃষ্টি পড়তো না। পুরুষরা নিজেদের মুখ এবং মনোযোগ সামনে রাখতেন এবং মহিলারা পিছনে বসা থাকতেন। মহিলারা যখন পিছনে থেকে উঠে বাইরে চলে যেতেন তখন পুরুষরা উঠে আসতো। আজকাল বিভিন্ন প্রকারের পর্দার ব্যবস্থা সম্ভব, তাই আমরা মসজিদের এক অংশে পর্দা টেনে নিই, একদিকে পুরুষরা বসে অপর দিকে মহিলারা। যে ব্যবস্থাই আপনারা গ্রহণ করুন, এই বিষয়টি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, এই হাদীসের আলোতে নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনের এবং তাঁর সম্ভ্রান্ত ও পবিত্র স্ত্রীগণের বাস্তব নকশা ছিল ইহাই যে, তাঁরা বাজমাত নামাযের জন্য নিজেদের গৃহকে মসজিদ বানিয়ে নেননি বরং বাজমাত নামাযের জন্য তারা নিজেদের গৃহ হতে সংলগ্ন মসজিদে যেতেন। এরূপ রেওয়ায়াত ব্যাপকাকারে পাওয়া যায়, যার জন্য আর অধিক প্রমাণের কোন প্রয়োজন নেই, ইহা সর্বস্বীকৃত রেওয়ায়াত যার সম্বন্ধে মুসলিম উম্মতের সকলেই জ্ঞাত আছেন। সুতরাং দু'টি নামাযের কথা বিশেষ করে এস্থলে প্রণিধানযোগ্য, এক তো জুমুআর নামায আর দ্বিতীয় ফজরের নামায। এ দু'টি নামাযে মহিলাদের অধিকার রয়েছে যে, তারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী- নিজেদের নারীসূলভ প্রয়োজন অনুযায়ী যে পদ্ধতি ইচ্ছা অবলম্বন করতে পারে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে না যে, অমুক নামাযে কেন (মসজিদে) আসোনি? যাদিগকে আল্লাহ্‌তাআলা অনুমতি দান করেন এবং যাদিগকে তাদের অন্তর এর জন্য উদ্বেলিত করে তুলে যে, ইহা অবশ্য অতিরিক্ত পুণ্য কাজ হওয়া সত্ত্বেও আমি চাই মসজিদে গিয়ে জমাতের সঙ্গে নামায আদায় করতে, সেক্ষেত্রে তাদের জন্য ব্যবস্থাও থাকতে হবে। সুতরাং ইহা একটি পৃথক বিষয়। মহিলাদের উপর ফরয নয় যে, তারা জুমুআর নামায বাজমাত আদায় করবে। মহিলাদের উপর ফরয নয় যে, তারা ফজরের নামায বাজমাত আদায় করবে; কিন্তু এক অতিরিক্ত পুণ্য কাজ, যার জন্য তাদের নিজ থেকে এই ইচ্ছা জন্মতে পারে যে, এই নামায বড় উচ্চাঙ্গের নামায, জমাতের সঙ্গে নামায পড়া উচিত। এ দিক দিয়ে আমাদের উচিত যেন আমরা ঐ নামাযে শামিল হই।

এই বিষয়ে আরো কতিপয় হাদীস রয়েছে যেগুলি দ্বারা বিষয়-বস্তু আরো সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই আমি এখন আমার ঘরের এক নিয়মকে পরিবর্তন করে ফেলেছি। কোন কোন মহিলা হয়তো অবাক হতে পারেন যে, কেন আমি মহিলাদেরকে ঘরে জুমুআর নামাযে আঁসা বন্ধ করে দিয়েছি। ইতোপূর্বে লাউড স্পীকারের মাধ্যমে আমাদের ঘরের দোতালায় মহিলাদের জন্য জুমুআর নামায বাজমাত পড়ার ব্যবস্থা ছিল। আমার মেয়েরা এবং আগত মেহমানরাও সেখানে আমার পিছনে বাজমাত জুমুআর নামায পড়ে নিত। ফজরের নামাযের মধ্যেও অনবরত এই নিয়ম ছিল যে, যাদের ইচ্ছা হতো তারা পড়ে নিতো। এই হাদীসের উপর চিন্তা করে আমি এই নিয়মকে পরিবর্তন করে দিলাম। এই ঘর এইরূপ যে, মসজিদ সঙ্গেই। নীচতলায় বাজমাত নামায পড়ার রীতিমত ব্যবস্থা রয়েছে এবং দূর দূর থেকে মহিলারা আসে। যারা এখানে ঘরের সঙ্গে থাকে তাদের একান্ত কর্তব্য তারা যেন ঘর ছেড়ে নীচে নামে এবং বাজমাত নামাযে এইভাবেই অংশ নেয় যেভাবে অন্যান্য মহিলারা বাজমাত নামাযে অংশ গ্রহণ করছে। এই হলো কারণ যার জন্য আমি এখন এই নিয়মকে পরিবর্তন করে দিয়েছি। আগমনকারী মেহমানদিগকে, যারা পূর্বে এখানে আসতো, আমি তাদের নিকট আহ্‌বান জানিয়েছি যেন তারা অবশ্যই আমাদের ঘরে আসেন। কিন্তু নামায পড়ার যে নিয়ম, সেই অনুযায়ী আমার মেয়েরাও নীচে নামবে এবং অন্যান্য সকলের সাথে নামায পড়বে।

এতে আরো একটি হিকমত এই রয়েছে যে, যদি কোথাও বাজমাত নামায পড়ার ব্যবস্থা থাকে তাহলে গৃহবাসীর এই অধিকার নেই যে, কিছু লোককে অনুমতি দিবে আর কিছু লোককে অনুমতি দিবে না। এমতাবস্থায় সেই কক্ষ বা স্থান যা এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত করা হয়েছে উহা আল্লাহ্‌র জন্য এক ইবাদতখানার রূপ ধারণ করে – মসজিদ সব আল্লাহ্‌র জন্য। যদি সেখানে বাজমাত নামায এমনভাবে হয় যে, সেই স্থানটি মসজিদের স্থানে পরিণত হয়ে যায় তাহলে আমার বা অন্য কারো এই অধিকার থাকে না যে, সে দরজার উপর প্রহরী নিয়োজিত করে এবং বলে যে, এই মসজিদ বিশেষ বিশেষ মহিলাদের জন্য, তারাই আসতে পারে, অন্য মহিলাদের অধিকার নেই। এইরূপে পুরুষের যদিও নয় কিন্তু ছোট বাচ্চাদের অধিকার নেই যে, তারা আসুক । এইজন্য সম্পূর্ণ প্রথাটি ভুল ছিল, যদিও পুণ্য উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তদন্তের পর ইহাই প্রমাণিত হলো, যা আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করলাম। সুতরাং যদি আপনারা আপনাদের ঘরে বাজমাত নামাযের ব্যবস্থা করতে চান, যেমন আমার নির্দেশ অনুযায়ী অনেক জার্মান ঘরে ব্যবস্থা রয়েছে, তাহলে এই কথা স্মরণ রাখবেন যে, সেই স্থানকে অন্যের জন্য নিষিদ্ধ করবেন না। যদি অভ্যন্তরীণ নামায হয়ে থাকে তাহলে এটা ভিন্ন প্রকারের নামায, পারিবারিক নামায, যা আপনারা মিলে পড়তে পারেন কিন্তু ইহাকে বাজমাত নামাযের প্রকৃত স্থলাভিষিক্ত বলা যেতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই স্থান সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়। এই দিকে দিয়ে বন্ধুগণ অবস্থা বিশেষের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। যে সকল ঘরে এই কারণে নামায বাজমাত পড়ার ব্যবস্থা করা

হয়েছে যে, ঐ অঞ্চলের লোকের জন্য মসজিদ দূরে আছে, তাহলে তারা একত্রিত হতে পারে। তাদের দলাদলি করার আদৌ কোন অধিকার নেই। শর্ত ঐ নামাযের জন্য, যে-ই আসবে তার জন্য দরজা উন্মুক্ত থাকবে। কিন্তু ইহাকে যদি মসজিদের স্থলাভিষিক্তরূপে বানানো না হয়, মসজিদ না থাকার দরুন বা দূরে থাকার কারণে পারিবারিকভাবে নামায পড়তে হলে, যেরূপে ইচ্ছা পড়তে পারেন কিন্তু উহা মসজিদে নামায পড়ার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। সুতরাং এস্থলে একটি প্রভেদ ছিল যা আমি বলতে চেয়েছিলাম।

এখন যদি ঐ সকল লোক যাদের মসজিদ মজুদ রয়েছে বা মসজিদ এতটুকু দূরত্বে রয়েছে যে, তারা মসজিদে যেতে পারেন তারা যেন নিজেদের সন্তানদেরকেও প্রস্তুত করেন এবং নিজেরাও রীতিমত আসেন। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে তাদের অনেক উত্তম তরবীয়ত হবে। এই হেদায়াতের উপর আঁ হযরত (সাঃ)-এর হেদায়াত প্রযোজ্য হবে যে, প্রত্যহ আপনি পাঁচ ওয়াক্ত দেহের ময়লা ধৌত করছেন।

এতটুকু ব্যাখ্যার পর এই সম্পর্কে আরো কিছু কথা আমি আপনাদের সম্মুখে রাখছি। এক তো প্রাসঙ্গিক কথা এই যে, আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ এখন যে, আমার সামনে লেখা উপস্থিত আছে, বেশ পরিষ্কার الصَّلَوٰتِ ই পড়া যাচ্ছে। গত শুক্রবারে আমার সম্মুখে যে লেখা ছিল যেহেতু বিষয়-বস্তু মনে ছিল এইজন্য একটি সাধারণ জানা কথাও মন থেকে স্খলিত হয়ে গেল যে, الصَّلَوٰتِ না الصَّلٰوةِ প্রথমটা, পরে লোকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো যে, আপনি খুৎবায় الصَّلٰوةِ ই পড়েছেন। অথচ এই আয়াতটি আমার সাধারণভাবেই মুখস্ত আছে, আমি حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ ই পড়ে থাকি। কিন্তু ঐ সময় সেই কাগজের দরুন যা আমার সামনে ছিল ওটাতে লম্বা ت দিয়ে লেখা ছিল না; আসলে الصَّلَوٰتِ লম্বা ت দিয়ে লেখা হয়। যদি লম্বা ت দ্বারা লেখা থাকে তা হলে তৎক্ষণাৎ আমরা বুঝে ফেলি যে, এখানে الصَّلٰوةِ নয় বরং الصَّلَوٰتِ পড়তে হবে। ওখানে যেহেতু লম্বা ت দিয়ে লেখা ছিল না তাছাড়া হারাকাত (যের, যবর ও পেশ)ও স্পষ্ট ছিল না এইজন্য অজ্ঞাতসারে মুখে الصَّلٰوةِ উচ্চারণ হতে থাকে, যা ঐ সময় আমি বুঝতে পারিনি। পরবর্তীতে, যেমন সকলে জানেন জমাত আল্লাহ্‌র ফযলে বেশ কিছুক্ষণ এবং কড়া নজর রাখে, কেউ কেউ বড় আদব ও শিষ্টাচারের সাথে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, কুরআন করীমের আয়াত আপনি প্রথম অংশে الصَّلٰوةِ পড়েছেন অথচ حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ পড়া উচিত ছিল। এই কথা ঠিক, এস্থলে এই ব্যাখ্যার পরে আমি এই কথা বলবো যে, প্রথম ক্যাসেটে যেখানে যেখানে الصَّلٰوةِ পড়া হয়েছে উহাকে শুদ্ধ করে নিন এবং এখন যেভাবে আমি শুদ্ধ পড়েছি এই উদ্ধৃতি ওখানে রাখা যেতে পারে। এতে আমাদের ঐতিহাসিক রেকর্ডে শুদ্ধ তেলাওয়াত হবে। حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ নিজেদের নামাযগুলির হিফাযত কর; وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى বিষয়টি পূর্ণ হয়ই এইরূপে, এবং বিশেষভাবে মৌলিক নামাযের বিশেষভাবে মধ্যবর্তী –কেন্দ্রীয় নামাযের; অতএব এই মধ্যবর্তী কেন্দ্রীয় নামায বলতে সেই নামায বুঝায় (গরম পানি দেন, উহাতে মধু ইত্যাদি মিশানো প্রয়োজন নেই; শুধু গরম পারি দরকার। লোকে জানি না নিজ থেকে কত কিছু জিনিস বানিয়ে নিয়েছে। কেউ কাহ্‌ওয়া ঢেলে দেয়, কেউ মধু ঢেলে দেয়, আমার শুধু গরম পানি দরকার। কিন্তু এত গরম নয় যে, ঠোঁট পুড়ে যায়। আসলে এখানেও তারা দুই চরমাবস্থায় চলে যায়, الْوُسْطٰى তে থাকে না, দুই চরম অবস্থার মধ্যে থাকে। না কত কত জিনিস ঢালা হয় শুধু সাদা পানি দরকার – দেখ! ঐ কাজটাই হলো, কাহ্‌ওয়া প্রস্তুত হয়ে গেছে, প্রস্তুত করতে করতে অনেকটা সময় লেগে গেল, এত গরম যে, আমি ঠোঁটেই লাগাতে পারছি না) আচ্ছা, তাই আমি বলছিলাম যে, নামায الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى সেই কেন্দ্রীয় নামায যার হিফাযত করার জন্য আমাদেরকে বিশেষ আদেশ প্রদান করা হয়েছে। এই নামাযের হিফাযত করলে অন্যান্য সকল নামাযেরই হিফাযত হয়ে যায়। এই নামায সারা জগতে ঐ রূপেই নিজ সময়ের মধ্যে আসে এবং সময় মত এসে চলেও যায় কিন্তু অমনোযোগী লোকেরা নিজেদের অমনোযোগিতার মধ্যেই থেকে যায় এবং এই কথা ভুলে যায় যে, কোন কোন সময় একটি নামাযের প্রতিও যদি পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া হয় তা হলে কোন নামাযই খোদাতাআলার সামনে নষ্ট হয় না। এই দিক দিয়ে ইহা খুবই জরুরী যে, আমরা কেন্দ্রীয় নামাযের হিফাযত করি, উহার প্রতি মনোযোগী হই এবং উহাকে খাড়া করার চেষ্টা করি। আসল কথা এই যে, নামায খাড়া করার জন্য যে-শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ইহা এই দিকে ইঙ্গিত করছে যার প্রতি আমি পূর্বেও বার বার আলোকপাত করেছি। মানুষ নামাযকে এইজন্য খাড়া করে যে, ইহা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এবং প্রবণতা রয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজের নামাযকে কায়েম করার চেষ্টা করে বার বার তার মনোযোগ সরে যায়, আর যেমনই মনোযোগ সরে এবং প্রকৃত বিষয় হতে বিচ্যুতি ঘটে অমনি সে আবার মনোযোগ নিবদ্ধ করার চেষ্টা করে যেমন কোন কোন সময় বাতাসে নিজেদের কাপড় সামলাতে হয়। ছোট ছোট বালিকারা, যাদিগকে মাথায় উড়নি নেওয়ার জন্য মা-বাবারা শিক্ষা দিয়ে আমার কাছে সাক্ষাতের জন্য পাঠায়, দেখা যায় যে, উড়নি মাথা থেকে পড়ে গেলে, তারা বার বার তা মাথায় উঠাতে থাকে। এই পড়ে যাওয়াটাও সেরূপই। নামায আদাবের সাথে পড়া উচিত...নামাযের আদাবের মধ্যে যেন ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয়।....নামায যখনই ইহার স্থান ও মর্যাদা হতে নীচে পড়ে যায় তখনই

এটার একটা উপকারও নির্ণীত হয়। আর উপকার এই যে, ইহা তাকে (নামাযীকে) খাড়া করে। আসলে উভয়ই একে অপরের সহিত সম্পৃক্ত, যদিও পরস্পর বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তির নামাযই তাকে কায়েম করতে পারে।

কুরআন করীমে এই প্রকারের লোকদিগকে যারা সত্যবাদী এবং পুণ্যবান, তাদিগকে কায়েমীন এবং কওয়্যামস্বরূপ বলা হয়েছে – [যারা বার বার (নামায) উত্তোলনকারী]। **প্রথমে আপনারা নামায কায়েম করা শিখুন। তারপর নামাযও আপনাদিগকে কায়েম করতে থাকবে। ইহা একটি মৌলিক বিষয় যার প্রতি অমনোযোগী হলে আর সংশোধনের আশা করা যায় না। 'নামায কায়েম কর'-এর অর্থ এই যে, যখনই এথেকে মনোযোগ এদিক সেদিক সরে যায় তখনই উহাকে সেখানেই কায়েম কর। ইহা এমন এক সংগ্রাম যা আপনাদিকে সারা জীবনই অব্যাহত রাখতে হবে;** একবার দুইবারের বিষয় নয় বরং সর্বদাই চালিয়ে যেতে হবে। ইহাই সেই কেন্দ্রীয় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যে ব্যাপারে ক্ষতি সাধন করার জন্য শয়তান এত চেষ্টা করে যে, স্বয়ং নবী করীম (সাঃ)-এর নামাযগুলি থেকে মনোযোগ সরাবার চেষ্টা করতো। أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ۝ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰٓ ۝ তুমি কি তাকে দেখেছো যে নিষেধ করে (আমাদের) এক বান্দা (মুহাম্মদ-সাঃ)-কে যখন সে নামায পড়ে (৯৬:১০-১১)। সেই সময় অনেক রকমের বাধা-বিঘ্ন ও শয়তানী চেষ্টা চলতো, অনেক সময় দৈহিক কষ্ট দেওয়া হতো, অনেক সময় শোরগোল করা হতো; এমন কি উটের নাড়ি-ভূঁড়িও সেজদারত অবস্থায় তার উপর রেখে দেওয়া হতো, যেন নামাযের মধ্যে তার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। আঁ হুযূর (সাঃ) তখন অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ় মনোবল সহকারে মনোযোগ কায়েম করার চেষ্টা করতেন। সুতরাং ইহাই সেই বিষয় যার সূচনা করে এক সাধারণ ব্যক্তি যে খোদার খাতিরে নামায কায়েম করার চেষ্টা করে এবং করতে থাকে-ঐ বান্দার দিকে যে, পরিপূর্ণ দাস যে সর্বাধিক উত্তমভাবে নামাযের চাহিদা পূরণ করেছে। এইরূপ সংগ্রামের সময় হয়তো আপনাদের কেউ কেউ বলবে যে, নামাযে এইরূপে বার বার মনোযোগ নিবদ্ধ করার সংগ্রাম, কী না এক বিপদ মাথায় পড়েছে! আপনাদের এইরূপ সংগ্রামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া উচিত নয়। আসলে এই বিপদ এইজন্য মাথায় পড়েছে যে, যতটুকু আপনারা উহাকে সারাবার সংগ্রাম করেন, প্রকৃতপক্ষে ততটুকু আপনারা খোদার দিকে মনোযোগী হতে থাকেন। অতএব আপনার চতুষ্পার্শ্ব হতে যত শোরগোলের আওয়ায উঠে, যা আপনার নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, এসব আওয়ায আসলে অন্তরের সেইসব সম্পর্কের আওয়ায, যা দুনিয়াতে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে কিন্তু অন্যরা শুনতে পায় না। ইবাদতকারী বান্দা জানে যে, যখনই সে খোদার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে তখন দুনিয়া এক ভয়ানক পরীক্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়ায় তার পথে। শত সহস আকর্ষণীয় এবং কৌতুহলজনক বিষয় রয়েছে যা তার সামনে উপস্থিত হয় এবং মনোযোগ সরাতে চেষ্টা করে। এই সব সম্পর্ক যা জড় বস্তুর সঙ্গে জড়িত ও সম্পৃক্ত, এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে; আর নামায এই কাজ সম্পন্ন করে।

যখন আপনারা নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করবেন এবং এক এক করে ঐসব সম্পর্ক ছিন্ন করবেন এবং তাঁর দিকে মুখ ঘুরাবেন এবং খোদার জন্য নিজেদের আত্মাকে বিশুদ্ধ করতে থাকবেন। এই চেষ্টাতে নামায আপনাদের সাহায্য করবে এবং আপনাদেরকে খাড়া করাতে সাহায্য করবে। সুতরাং যখন আপনারা নামাযকে খাড়া করবেন ঠিক সেই মুহূর্তে নামাযও আপনাদিগকে খাড়া করবে। বাহ্যতঃ কারো কারো দৃষ্টিতে এস্থলে পরস্পর বিরোধ মনে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনাদের নামাযকে কায়েম করা এবং আপনাদিগকে নামাযের কায়েম করা আসলে একই বিষয়ের দু'টো দিক।

সুতরাং আপনারা আপনাদের নিজেদের নামাযের প্রতি মনোযোগী হোন এবং সন্তান-সন্তদিগকেও মনোযোগী করুন। তাদিগকে বুঝান যে, নামাযের মধ্যে কী কী মাহাত্ম্য রয়েছে। আর দ্বিতীয় দিকটি এইরূপ যে, ইহা নামাযকে খাড়া করার ব্যাপারে আপনাদের অনেক সাহায্য করবে। যদি কোন বস্তুর গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়ে যায়, যদি কোন বস্তুর উপকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে, তাহলে নিজ থেকেই মানুষের মনোযোগ ঐ দিকে নিবদ্ধ হয়। যাদের নামায অত্যধিক নীচে পড়ে যায় তাদের নামায সম্পর্কে জ্ঞান কম থাকে অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে নামাযের উপকারিতা সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান থাকে না। আর ঐসব উপকারিতার স্বাদও তারা পায় না। অতএব যখন কোন বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্‌তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত উপকারিতা সম্পর্কে কেউ জ্ঞান ও পরিচয় অর্জন করে এবং ঐ সকল উপকারিতা দ্বারা যে স্বয়ং উপকৃত হয়, তখন মনোযোগ আকর্ষণকারী উপকরণসমূহ নিজ হতে সরে যায়, তার নিকট ঐগুলোর কোন শক্তি ও আকর্ষণ থাকে না। অতএব এই হলো কর্মপদ্ধতি যদ্বারা মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক। প্রথমে, যেরূপে আমি বলেছি, চেষ্টা করুন, চেষ্টার দ্বারাও অনেকটা এই বিষয় লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু এই কথার চেষ্টা কেন করবেন না যার ফলে কৃত্রিম চেষ্টার কোন প্রয়োজন থাকে না। স্বয়ং অন্তর এক দিক থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করুক আর অন্য দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যাক। ইহা হলো দ্বিতীয় দিক, যাকে নবীগণ অবলম্বন করে থাকেন আর নবীদের অনুসরণে বিশ্বস্ত দাসরা অবলম্বন করে থাকেন; অর্থাৎ নামাযে প্রথমে নিজের অন্তরকে

আটকিয়ে নেন আর নামাযে অন্তরকে আটকানো হলো খোদার সঙ্গে অন্তরকে আটকিয়ে নেওয়ার নাম। খোদার অস্তিত্বের উপর এবং তাঁর উচ্চাঙ্গের গুণাবলীর উপর চিন্তা ভাবনা করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে ঐ চিন্তা-ভাবনার ফলাফল সম্পর্কে অবগত করুন যেন তারা এই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে যে, খোদাতে কী কী আকর্ষণীয় গুণাবলী রয়েছে যা নিজে নিজেই প্রকৃতিকে আকৃষ্ট করে। যদি এই যাত্রার দ্বিতীয় লক্ষ্যস্থলকে, যেমন নবী করীম (সাঃ) অতিক্রম করেছিলেন, আপনারাও অতিক্রম করেন তাহলে একটি বড় বিষয় লাভ হয়ে যাবে।

এ প্রসঙ্গে এই কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, নামায আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই সকল কথা, যা আমরা নামাযের মধ্যে বলে থাকি ঐগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি স্ব স্ব স্থানে মূল্যবান রত্নের ন্যায় যার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করার ফলে অনিবার্যভাবে অন্তরে মনোযোগ সৃষ্টি হবে। যদি আপনার কাছে বিভিন্ন প্রকারের অনেকগুলি পাথরের টুকরো থাকে আর আপনি না জানেন যে, কোনটি রত্ন, তাহলে আপনি পাথরের উপর ঐভাবেই দৃষ্টিপাত করবেন যেভাবে সাধারণ পাথরের উপর দৃষ্টিপাত করা হয় এবং আপনি আদৌ ঐগুলোর প্রতি কোন কৌতুহল দেখাবেন না। ঐসব পাথরের টুকরো হতে আপনার দৃষ্টি সরে আপনার পকেটে রাখা টাকা-পয়সার উপরেই পড়বে, তা যত সামান্যই হোকনা কেন। কিন্তু যদি অকস্মাৎ রত পরিলক্ষিত হয় যার চাকচিক্য দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে তাহলে যদিও আপনার পকেটে স্বর্ণ-টুকরাই থাকুক না কেন তথাপি আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে রত্নের দিকে দৌড়াবেন এবং উহাতে হাত লাগাবেন বা নেওয়ার চেষ্টা করবেন।

হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস্ সালাতো ওয়াস সালাম নিজের ব্যাখাসমূহের মধ্যে এরূপ মূল্যবান আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, রত্ন ও মণিমুক্তাস্বরূপ পেশ করেছেন; উজ্জ্বল, দীপ্তিমান বস্তুরূপে পেশ করেছেন যা লোকের মনোযোগকে কেড়ে নেয়। এ দিক দিয়ে, যেরূপে আমি আগেও বলেছি, আপনারা যদি নামাযের শব্দগুলির উপর গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা ও অনুধাবন করতে আরম্ভ করেন তা হলে চিন্তা ও অনুধাবন করার পর আপনারা দেখতে পাবেন যে, নামাযের ভাসা-ভাসা শব্দগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত মনে হবে, এবং বিস্ময়কর তত্ত্বসমূহ আপনাদের ভাগ্যে জুটে যাবে, এমন কি যখন আপনারা ঐ তত্ত্বসমূহকে মনে রেখে শব্দগুলিকে পুনরাবৃত্তি করবেন তখন অপরাপর নানা ধ্যান-ধারণা আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে, উহাতেও এই শক্তিই থাকবে না যে, এসব আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহের মোকাবেলায় আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। ইহাই জ্ঞানার্জনের বিষয় যার প্রতি আমাদের জমাতের বন্ধুদেরকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া উচিত এবং এই মনোযোগ সহকারে আপনারা ঐগুলোর উপর চিন্তা-ভাবনা করবেন ঐগুলোকে ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে দেখবেন না যে, এইগুলোর কী তাৎপর্য। যেমন, আঁ হযরত (সাঃ) ইরশাদ করছেন যে, দুই নামাযের মধ্যেও আমার অন্তর নামাযের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। এর মর্ম এই যে, নামাযের মধ্যে তিনি এত স্বাদ ও আনন্দ অনুভব করতেন যে, দুই নামাযের মধ্যে সেই স্বাদ ও আনন্দে অন্তর দোলায়িত ও মনোরঞ্জিত হতে থাকতো এবং পরবর্তী নামায তাঁকে পূর্ণ বেগে আকর্ষণ করতে থাকা তো। ইহার অবস্থা এমনই, যেমন দুই খাবারেরর মধ্যে মনে করেন দুপুরের ও রাত্রের খাবারের মধ্যে আপনি ভাববেন যে, দুপুরে যে উত্তম খাবার খেয়েছিলাম কাজ থেকে অবসর হলে পরে সেরূপ উত্তম খাবার আবার আসতেছে। এভাবে নিজ কাজে ব্যস্ত থাকেন এবং খাবারও স্মরণ করেন। ঐ যে অন্তরকে আটকিয়ে রাখার বিষয়টি, উহা অন্তরকে দুনিয়ার কাজকর্মে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হতে দেয় না। আপনি দুনিয়া অর্জনে ব্যস্ত হবেন, আপনি অনেক রকমের বিনোদনে ব্যাপৃত হবেন কিন্তু সেই স্বাদ যা প্রথমে পেয়েছিলেন অর্থাৎ প্রথম খাবার খেয়ে, তখন যদি জানা থাকে যে, সকল কাজ হতে যখন আমি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে অবসর হয়ে যাব তখন পুনরায় সেই স্বাদ ও আনন্দ পাবো; এভাবে অন্তর আটকা থাকবে যে, দুনিয়ার ব্যস্ততা ও বিনোদন আপনাকে নিজের দিকে এইরূপে আকৃষ্ট করতে পারবে না যে, আপনি নিজে পানাহার ভুলে যাবেন। কোন কোন সময়ে মানুষ পানাহারও ভুলে যায় কিন্তু উহার কারণ ও উপকরণগুলো ভিন্ন।

এ ব্যাপারে আমি পূর্বেও বলেছি, কিন্তু এখন আমি এই খুৎবায় ঐগুলো টানতে চাই না। উহা নিজস্থানে এমন গুরুত্বের রূপ ধারণ করে যে, ঐ সকল উপকরণ মানুষের মৌলিক কাজেও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এখনকার মত এই সব বিষয় ছেড়ে দিচ্ছি।

এখন আপনারা এই বিষয়ের দিকে ফিরে আসুন যে, যদি আপনারা নামাযে অন্তরকে আটকাতে চান তাহলে আপনারা নামাযে স্বাদ গ্রহণের বিষয়টি উপলব্ধি করুন। এই ব্যাপারে কিছু তথ্য আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি যে, উর্দু ক্লাসে গত কিছু পাঠ্য-বিষয়ে হিসেবে আমি নামায সম্পর্কে আলোকপাত করতে আরম্ভ করেছি এবং তাদিগকে এভাবে বুঝাচ্ছি যেরূপে শুরু থেকে আমি বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় বুঝাবার চেষ্টা করতাম। তাদিগকে নামায সম্পর্কে উহার গুরুত্ব বুঝাচ্ছি। আপনারা উর্দু ক্লাসটা পর্যালোচনা করলে দেখে অবাক হবেন যে, বুঝানোর পর শিশুরা কোন রকম ক্লান্তি বোধ করছে না, বরং আরো অধিক মনোযোগ সহকারে তারা উর্দু ক্লাস নিতে আরম্ভ করেছে। যেসব কথা আমি তাদিগকে বুঝাচ্ছি, যে পদ্ধতিতে তাদিগকে বুঝাচ্ছি ওগুলো

এমন যে, গল্পের চেয়ে বেশী কৌতুহলের সাথে তারা শুনছে। আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহ এবং আঁ হযরত (সাঃ) যে পদ্ধতিতে আমাদিগকে নামায শিক্ষা দিয়েছেন উহা জানার ফলে কোন কোন সময় আমার দৃষ্টি উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হয়ে উঠে— আনন্দে এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের ফলে তারা প্রফুল্ল বদন হয়ে উঠে যা দেখে আমি স্বস্তি বোধ করি। একই সময়ে উর্দু এবং নামায উভয় শিক্ষাই তারা লাভ করছে। উর্দুর প্রতিও উৎসাহ এবং নামায সম্পর্কেও তত্ত্ব-জ্ঞান বাড়ছে। এই ক্লাসগুলো এক সঙ্গেই চলবে। ক্লাসগুলোতে, যেরূপে আমার অভ্যাস, বিভিন্ন দিক থেকে বিচিত্র জিনিস তুলে ধরি সাথে সাথে নামায ও ইহার তত্ত্বাদি যাতে দুনিয়ার পরিবেশের বিষয়ও সাথে সাথে অব্যাহত থাকে এবং শিশুরা যেন এইরূপ অনুভব না করে যে, তাদিগকে এমন বক্তৃতা দেয়া হচ্ছে যা তাদের বোধ-শক্তির উর্ধ্বে, যা তাদের প্রকৃতি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত নয়। যেহেতু উর্দুও শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য এজন্য নামাযের বিষয়ে যেখানেই সুযোগ হয়, কোন কোন উর্দু বাগ্‌ধারা ও উহার ব্যাখা প্রসঙ্গে তাদের মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেই। কেননা, যদি বাগ্‌ধারার মর্ম না বুঝে তাহলে তারা নামাযেরও মর্ম বুঝতে পারবে না। এই দু'টি জিনিস এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে যে, একটি আগে বাড়লে অপরটিও সঙ্গে আগে বাড়ে। এ অবস্থায় কোন দর্শক দেখে বুঝতেও পারে না যে, নামায শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। কারণ ইহার কোন কোন অংশ (উর্দু ক্লাসের) নামায থেকে সরে শব্দসমূহের অর্থ ও ব্যাখা এবং প্রকৃতিগত আইন-বিধান, এইরূপ বিষয় বলতে গিয়ে কোন কোন অংশ এদিক সেদিক হয়ে যায়, তখন হয়তো কেউ মনে করতে পারে যে, আমি আসল বিষয় ছেড়ে দিয়েছি; কিন্তু যখন আমি আবার ফিরে আসি তখন তারা বুঝতে পারে যে, আমার বিষয়-বস্তু (উর্দু ক্লাসের) সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্ত হচ্ছে।

সুতরাং আপনাদের কৌতুহলের বিষয়ে কোন অভাব ঘটবে না, যে-সকল কৌতুহলের প্রেক্ষাপটে আপনারা উর্দু ক্লাস নিতেন, সেই সকল কৌতুহল যথাস্থানে ঠিক আছে এবং ঠিক থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। যেরূপে আমি বলেছিলাম "উর্দু মায়েদা ক্লাস" ইহাতে দস্তরখানও বিছানো হয় এবং কিছু খাবার জিনিসও সাজানো হয়, ইহা বন্ধ হবে না। নামাযের সঙ্গে সঙ্গে যেরূপে আধ্যাত্মিক খাবার পরিবেশিত হয় তদ্রূপে দৈহিক খাবারও সঙ্গে সঙ্গে চালু থাকবে।

সুতরাং আমি আশা করি যে, ইনশাআল্লাহ্ নামাযের যে সকল বিস্তারিত বিবরণ খুৎবার মধ্যে আমি ব্যক্ত করি না সেগুলো আবার বর্ণনা করা মুশকিল, কারণ আমি পূর্বে খুৎবার মধ্যে কিছু ব্যক্ত করেছি, কিছু বিষয় কোন কোন দরসে ব্যক্ত করেছি, ঐ বিষয়গুলোকে অনবরত আর আগে বাড়ানো যায় না। এই যে একটি দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে যে, জুমুআর খুৎবায় অনবরত নামায সম্পর্কে বলা যেতে পারে না, এর একটি সংশোধন রয়েছে যা উর্দু ক্লাসে বর্ণনা করা হয়। অতএব উর্দু ক্লাসকেও নামাযের ক্লাসের অংশ মনে করবেন। অতএব ভবিষ্যতে যখন উহা (ক্লাস) দেখবেন তখন এই ধারণা নিয়ে দেখবেন যে, আপনাদের জাগতিক জ্ঞানের সঙ্গে ধর্মীয় জ্ঞান বাড়বে। উহাতে নামাযের তত্ত্ব-বিষয় বিভিন্ন ভঙ্গিতে অবস্থা ও দিক পরিবর্তন করে আপনাদের সম্মুখে পেশ করা হবে, ইনশাআল্লাহ্‌তাআলা। নামাযের প্রারম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ **সালাম ফেরানো** পর্যন্ত যে যে বিষয়-বস্তু এতে নিহিত আছে যেগুলো জানা আপনাদের জন্য জরুরী, যেগুলোর জ্ঞানের সঙ্গে জড়িত আপনাদের কৌতুহল, এই কৌতুহল বিনাব্যতিক্রমে আগে বাড়তে থাকবে। এই বিষয়টি উর্দু ক্লাসে সোপর্দ করা হয়েছে, উহা দ্বারা ইনশাআল্লাহ্‌তাআলা না আপনাদের কৌতুহলে অভাব ঘটবে, না গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার ব্যাপারে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে।

এই খুৎবা বা জুমুআয় আমি এজন্য বিস্তারিত বর্ণনা করে দিলাম, কারণ এখন থেকে পরে আমি বিস্তারিত বর্ণনা করতে পারবো না। আপনারা এটা মনে করবেন না যে, আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি। নামাযের প্রতি কৌতুহল সৃষ্টি করার জন্য আমি আপনাদের সামনে এই মৌলিক কথা রাখতে চাই। নামায সম্পর্কে আপনাদের প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞান জানা একান্ত জরুরী, **নামায সম্পর্কে তত্ত্ব-জ্ঞান এমন এক বিষয় যা দুনিয়া হতে আপনাদের মনোযোগ ফিরাতে পারে এবং নামাযের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারে**। এই তত্ত্ব-জ্ঞান নিজস্থানে এমন এক শক্তি, যার মোকাবেলা দুনিয়ার শক্তি করতে পারে না। ইহা প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যে বিষয়ে আপনি তত্ত্ব-জ্ঞান অর্জন করবেন যে, ইহাতে আমার অস্তিত্বের জন্য কল্যাণ নিহিত আছে। আমার অন্তরের জন্য স্বাদ ও আনন্দ নিহিত আছে। সেই প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞান স্বয়ং এই কথার জামিন হয়ে যায় যে, আপনি আপনার মনোযোগ ঐ দিকে ফিরিয়ে দেন। ইহা বলা তো সহজ কিন্তু করা এজন্য কঠিন যে, কোন কোন সময় দুটো ধারা একই সময়ে প্রবাহিত হয় এবং প্রত্যেকেরই নিজ নিজ চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন থাকে। প্রথম দিনই কোন ব্যক্তি তত্ত্ব-জ্ঞানী দাস হতে পারে না। অনেক দীর্ঘ পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে। অতএব এইরূপ ধারণা করে নেওয়া যে, উর্দু ক্লাস শুনে নিলে অথবা কয়েকটি খুৎবা শুনে নিলে অকস্মাৎ আপনি আপনার স্থানের পরম শিখরে উন্নীত হবেন এবং আপনার সকল মনোযোগ উহাতে নিবদ্ধ হয়ে যাবে। এইরূপ ধারণা অন্তর থেকে বের করে দিন। কিন্তু যে-সব কথা আমি বলছি এগুলো আপনার জন্য কল্যাণজনক ও উপকারজনক হবে এবং ধীরে ধীরে আপনার নামাযের প্রকৃতি পরিবর্তন হতে থাকবে এবং ইহা উন্নত হতে উন্নততর হতে থাকবে এবং ধীরে ধীরে আপনি

আপনার নামাযের মধ্যে আল্লাহ্‌তাআলার সকাশে এমন দোয়ার সৌভাগ্য পাবেন যা প্রথম দিন ছিল না এবং স্বাদ ও আনন্দের স্থানসমূহ কিছু বৃদ্ধি পাবে যা ধীরে ধীরে আরো এইরূপ স্থান সৃষ্টি করতে থাকবে। অর্থাৎ কোন কোন স্থানে এমন চিহ্নে পরিণত হবে যার মধ্যে আপনার কৌতুহল চিরকাল কায়েম থাকবে। সেই চিহ্ন ধীরে ধীরে বিস্তৃত হতে থাকবে যা আপনার গোটা অন্তরকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে। ঐগুলো যতই আগে বাড়তে থাকবে এবং বিস্তার লাভ করতে থাকবে ততই আপনার অন্তরে আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে আরো বেশী সম্পর্ক স্থাপনের স্থানসমূহ সৃষ্টি হতে আরম্ভ করবে। আপনার নামাযের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এবং অবশেষে, আর আমি যখন 'অবশেষে' বলি তখন মনে রাখতে হবে যে, বিষয়-বস্তুর কোন শেষ নেই বরং মানুষের একটি শেষ আছে, অবশেষে আপনি এই অবস্থায় আপনার প্রভুর সম্মুখে হাজির হতে পারবেন যে, আপনার যাত্রা খোদার দিকের হবে, খোদাকে ছেড়ে দুনিয়ার দিকে হবে না যদিও সম্পূর্ণ যাত্রা মানুষের জন্য প্রয়োজন নেই, কারণ খোদার অস্তিত্ব অসীম কিন্তু ইহা সম্ভব যে, গতি খোদার দিকে হবে। এই যাত্রার সময় আপনি ধীরে চলুন বা দ্রুত চলুন কিন্তু আপনি নিজেকে খোদার দিকে অগ্রসরমান এবং নিকট হতে নিকটতর হতে অনুভব করবেন। ইহা হলো উদ্দেশ্য ও কাম্য স্থান আমাদের জীবনে যা আমরা অবশ্যই লাভ করতে পারবো। কিন্তু তত্ত্ব-জ্ঞানের পূর্ণতার ধাপ মৃত্যুর পরও চলতে থাকবে। এইরূপ ধারণা যে, নবী করীম (সাঃ) যে তত্ত্ব-জ্ঞানের অবস্থায় খোদার সামনে হাজির হয়েছিলেন এখন পর্যন্ত সে তত্ত্ব-জ্ঞানের অবস্থায়ই আছেন। ইহা অত্যধিক নির্বুদ্ধিতামূলক ও মুর্খতাপূর্ণ এবং অপমানজনক ধারণা। ইহাতে আঁ হযরত (সাঃ)-এর সম্মান বৃদ্ধিও হয় না এবং খোদাতাআলার তৌহীদের চাহিদাও পূর্ণ হয় না। আল্লাহ্‌র একত্ব এবং তাঁর অসীম হওয়া নির্দেশ করছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের সময় যে তত্ত্ব-জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা স্থগিত হবে না, কখনো স্থগিত হবে না। মৃত্যুর পর খোদার অস্তিত্বের দিকে তাঁর তত্ত্ব-জ্ঞানের যাত্রা সদা-সর্বদা সঠিক অব্যাহত থাকবে। তাঁর মর্যাদার উন্নতির জন্য দোয়াগুলো যা শিখানো হয়েছে তা আমরা করছি এবং করতে থাকবো। আর এই দোয়াগুলো নিজ স্থানে জরুরী হোক বা না হোক তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। এ অবস্থাই আমাদের দুর্বল বান্দাদের। আমরা মৃত্যু পর্যন্ত এই যাত্রাকে গ্রহণ ও বরণ করতে পারি যা খোদার দিকে নৈকট্যের যাত্রা, খোদাকে পূর্ণরূপে পাওয়ার যাত্রা, যা আমাদের যাত্রার শেষে কাম্য ও লক্ষ্য-বস্তু। ইহা এমন অস্তিত্ব যা কখনো শেষ হবার অস্তিত্ব নহে, অসীম ও অনন্ত অস্তিত্ব, এমন অনন্ত অস্তিত্ব যে, মানুষের মস্তিষ্ক অক্ষম হয়ে পড়ে কিন্তু তার সূক্ষ্মতম রহস্যাবৃত বিষয় বুঝতে পারে না। এই ধারণা অন্তর থেকে বের করে দিন যে, আপনি আল্লাহ্‌তাআলার অস্তিত্ব ও তাঁর রহস্যাবৃত কুল কিনারাকে পেতে পারবেন। لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ তাঁর অনুরূপ কোন বস্তু নাই অর্থাৎ সকল সৃষ্টি স্রষ্টার সৃষ্টির হওয়ার কারণে স্রষ্টার রং ধারণা করেছে কিন্তু নিজে স্রষ্টা নয়, তাই সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে প্রভেদ এইরূপ থাকবে যা সৃষ্টি বুঝতে পারে না। কারণ তারা যা দেখছে সৃষ্টিই সৃষ্টি দেখেছে, নিজে অনুরূপ দেখেছে নিজেদের সৃষ্টির মাঝে কাকেও স্রষ্টা হিসেবে দেখে নি। স্রষ্টা সর্বদা গুপ্ত থাকেন যেভাবে প্রত্যেক শিল্প হতে শিল্পী গুপ্ত থাকে। বৃহৎ হতে বৃহত্তর ছবি উঠিয়ে দেখেন যা দুনিয়াতে অনেক খ্যাতি লাভ করে ফেলেছে। সেই ছবিতে যদি অনুভূতিও থাকে, তবু যে মাথা ইহাকে জন্ম দিয়েছে, যে সৃষ্টি করেছে, যে হাতগুলো ছবি একেছে, ঐগুলো তাকে বুঝতে পারে না। অতএব সৃষ্টি ভিন্ন জিনিষ এবং স্রষ্টা ভিন্ন। দার্শনিকেরা অনেক জোর লাগিয়েছে কিন্তু খোদাতাআলার সূক্ষ্ম অস্তিত্বকে পেতে পারেনি। এই কারণে কোন কোন শীর্ষস্থানীয় প্রাচীন দার্শনিক এই বিষয়কে বুঝে ফেলেছে যে, খোদার অস্তিত্বকে পাওয়া সৃষ্টির পক্ষে সম্ভবই নয়। এই দিক দিয়ে তাঁর অস্তিত্ব স্বতন্ত্র থাকলো। কিন্তু ঐ গুণাবলী যা সৃষ্টির মাঝে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোকে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব। ঐ গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমাদের যাত্রা অব্যাহত থাকবে। এমনকি সেই গুপ্ত হতে গুপ্ততর অস্তিত্ব অন্য বিকাশসমূহের প্রকাশ ঘটাবেন এবং সেই সব বিকাশের মধ্যে আমাদের যাত্রা আগে অব্যাহত থাকবে। ইহা দুনিয়া ও পরকালের যাত্রা যা আমরা গ্রহণ ও বরণ করবো। যদি পূর্ণ অনুভূতির সাথে যাত্রার তত্ত্বাবলী উপলব্ধি করার সূচনা এই দুনিয়াতে আমরা না করি তাহলে পরকালেও এই সকল ভাগ্যে জুটবে না। যে দুনিয়াতে অন্ধ সে পরকালেও অন্ধই থাকবে। সুতরাং এই তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রতি চক্ষু খোলার উদ্দেশ্যে, সকল জমাতের চক্ষু খুলার উদ্দেশ্যে, আমি বার বার নামাযের গুরুত্বের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই অর্থে জমাতকে বুঝেন যে, ঘরে নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে, স্ত্রীদিগকে নামায সম্বন্ধে বুঝান, তারপর তারা তাদের পরবর্তী বংশধরকে বুঝাবে। যদি নামাযের বিষয়টি জমাত এমনভাবে বুঝে ফেলে যে, ইহা জামাতের অঙ্গে পরিণত হয়। তাহলে আমরা শান্তি ও স্বস্তির সাথে প্রাণ দিতে পারবো এই কথা চিন্তা করে যে, আল্লাহ্‌তাআলা আমাদিগকে তৌফীক দান করেছেন দূর পর্যন্ত ভাবী বংশধরকে খোদার পথে পরিচালিত করার। শয়তান তাদিগকে প্রতারিত করবে এবং প্রতারিত করার চেষ্টা করবে; আপনাদিগকেও প্রতারিত করবে, আপনাদিগকে প্রতারিত করার চেষ্টা করবে কিন্তু সাহস ও চেষ্টার সাথে নিজেদের নামাযকে খাড়া করতে থাকুন। এরূপে খাড়া করতে থাকার সৌভাগ্যই আমাদের ভাগ্যে জুটেছে।

পূর্ণরূপে খাড়া করার তৌফীক আমাদের নেই। এজন্য এই বিষয়ের শেষ অংশ হলো দোয়া। আল্লাহ্‌তাআলার নিকট এসব চেষ্টার মধ্যে দোয়া করা, যা শুধু নামাযের মধ্যেই যেন না হয় বরং এর পরেও যেন দোয়া করার অভ্যাস হয়। ইহা একটি মৌলিক তত্ত্ব। ইহা হতে বিমূখ হলে এই সব তত্ত্ব লাভ করার পথে বড় বাধা সৃষ্টি হবে। অতএব নিজেদের জন্য দোয়া করুন--দৃঢ় সংকল্পসহকারে এবং প্রত্যহ দোয়া করুন। যদি দোয়া না করেন তাহলে নামাযের প্রতিও মনোযোগ হবে না। দোয়ার মাধ্যমে এই মনোযোগকে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করুন এবং যতই আপনার দোয়া কবুল হবে আপনার অন্তরের উপর এক প্রভাব বিস্তৃত হবে এবং এক নকশা অংকিত হবে যেভাবে সমুদ্রে হতে বাতাস উঠে উহাতে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়; অথচ পিছনে যে পানি থাকে উহাতেও বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে। ইহা হলো প্রকৃতির বিধান, যা আমাদের অন্তরে সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি করে। সুতরাং দোয়ার তত্ত্ব-জ্ঞান অতি গভীর বিষয়। ইহার কবুলিয়ত সম্বন্ধে আলোকপাত করা এখন সম্ভব নয়। একটি কথা আমি আপনাদিগকে বলবো যে, আসল দোয়া উহাই যা অন্তর থেকে উঠে, উঠার সময় কবুলিয়তের নিদর্শন ছেড়ে যায়, আর সেই নিদর্শনই হলো আপনার কাছে আমানত; সেই নিদর্শন আপনার সাহস ও মনোবলকে বৃদ্ধি করবে, সেই নিদর্শন আপনার বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করবে যে, আপনি যে দোয়া করেছিলেন উহা বিশুদ্ধ-চিত্তে করেছিলেন এবং উহার এক পুণ্য প্রভাব আপনার অন্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং এরূপে দোয়া, যেরূপে আমি বলেছি, আপনার দুনিয়াকে রক্ষা করবে এবং পরকালকেও। দোয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে তৌফীক দান করেন সব দিক দিয়ে যেন আমাদের নামায আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য হয়ে যায়, তাঁর জন্যই নিবেদিত থাকে। এবং আমাদের ভাবী বংশধরকেও এই পুণ্য পথেই কায়েম রাখেন।

এই প্রসঙ্গে যে হাদীস আমি বেছে নিয়েছিলাম ঐগুলো বর্ণনা করার সময় আমার নিকট নেই কিন্তু দৈনন্দিন স্বাভাবিক বিষয় যা আমাদের সামনে থাকা উচিত যে, কোন কোন সময় আমাদের অভ্যন্তরীণ কারণ ছাড়া দৈহিক কারণসমূহও আমাদের নামাযে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং দৈহিক প্রয়োজনসমূহও বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এই বিষয়েও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীসকে মুসলিম কিতাবুস্‌সালাত হতে গ্রহণ করা হয়েছে। আঁ হযরত (সাঃ)-কে হযরত আয়েশা (রাঃ) ইহা বলতে শুনেছেন, যখন দস্তরখান বিছানো হয় এবং খাবার সাজানো হয় তখন নামায আরম্ভ করা উহাকে খারাপ করারই প্রকারান্তর। "যখন দস্তরখান বিছানো হয় এবং খাবার সাজানো হয়"— ইহার মর্ম এই নয় যে, খাবারকে গুরুত্ব দাও, নামাযকে ছেড়ে দাও। এখানে নসীহত এই করা হয়েছে যে, এমন সময় দস্তরখান বিছিও না যখন নামাযের সময় হয়ে যায় নচেৎ অর্ধেক মনোযোগ তোমাদের দস্তরখানের উপর থাকবে আর অর্ধেক নামাযের মধ্যে। কেউ কেউ ইহার অন্য মর্ম গ্রহণ করে। খাবারের সময় তখনই রাখে যখন নামাযের সময় নির্দিষ্ট করা থাকে। তখনা তারা খাবার আরম্ভ করে। কেউ যদি বলে নামাযের জন্য চল। তারা বলে, দেখ! নবী করীম (সাঃ) খাবার আরম্ভ করার কথা বলেছেন, এবং নামায পরে পড়ার জন্য। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায় সাল্লামের আদৌ এইরূপ আদেশ নয়। কতক মানবীয় প্রয়োজন আছে যা কদাচিৎ নামাযের সময় আসতে পারে তখন অবশ্য সেই প্রয়োজন পূর্ণ করা উচিত। যা আমাদের ক্ষমতার মধ্যে আছে উহা তো কমপক্ষে গ্রহণ করা উচিত। পরবর্তী কথা নবী করীম (সাঃ) এমন বলেছেন যা আমাদের ক্ষমতার ভিতরে নয়। এবং প্রথম দৃষ্টান্তের বিষয়ে আরো ব্যাখ্যা দিয়ে দিলেন। এরূপে যদি দু'টি নোংরা জিনিষ অর্থাৎ পেশাব পায়খানা বাধা দেয় তখনো নামায পড়া অর্থবিহীন। এখন আপনারা চিন্তা করে দেখেন যে, এই সব প্রয়োজন নিজ থেকে সৃষ্টি হয় এবং মানুষের মন বলে দেয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ সব প্রয়োজন সেরে নিব ততক্ষণ পর্যন্ত আমি নামায পড়তে পারবো না। এতটুকু অংশ অপারগতার দরুন। কারণ এইরূপ প্রয়োজন সৃষ্টি হওয়া মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত। এরূপ প্রয়োজন না সেরে যদি কেউ নামাযে চলে যায় তাহলে তার নামায নিরর্থক হবে, নামাযের প্রতি তার কখনো মনোযোগ হতে পারবে না।

অতএব আঁ হযরত (সাঃ) দুটি কথাকে আশ্চর্যজনকভাবে একত্রে বেঁধেছেন, এক খাবার আর দ্বিতীয় খাবারের পরিণাম। পরিণামের বিষয়টি তো আমাদের ক্ষমতার বিষয় নয়। এই পরিণাম ও প্রয়োজন দেখা দিলে প্রথমে তাড়াতাড়ি উহা সেরে নামাযে আসা উচিত। কিন্তু যে অংশটি দিয়ে সূচনা, উহা অবশ্য আমাদের ক্ষমতার ভিতরে থাকে। **এমন সময়ে খাবারের প্রস্তুতি নিও যা নামাযের সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে পারে। নিজেদের অভ্যাস এমন বানাও এবং সন্তানদেরকে শিক্ষা দাও যে, তাদের খাবারের নিয়ম-কায়দা ও আদব নামাযের সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি না করে। নিজেও অভ্যাস কর এবং শিশুদেরকেও পাকাপোক্তরূপে এসব আদব-কায়দা শিক্ষা দাও। খাওয়া-দাওয়ার আদব নামাযে যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে।** এরূপে ইন্‌শাআল্লাহ্‌তাআলা ঐসব বাহ্যিক উপকরণ যা নামাযে বাধা সৃষ্টি করে ঐগুলো হতে আপনারা নিষ্কৃতি পেতে পারেন।

(ওডিও ক্যাসেট থেকে সরাসরি অনূদিত) অনুবাদ ঃ আলহাজ্জ মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী

ধর্মের পরিচয় ও এর প্রয়োজনীয়তা

হযরত মাওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব (রাঃ)

অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ধর্ম কি মানুষের বুদ্ধি বিবেককে ভোঁতা করে?

(শেষ কিস্তি)

এ সময়কে দৃষ্টিপটে রেখে স্বভাব ও প্রকৃতিকে যদি প্রশ্ন করা যায় তাহলে স্বভাব কখনও নিজের জন্যে ব্যক্তিগত ও জাতীয় অবস্থাকে সমীহ করে এরূপ কঠোর ধৃত ও ধ্বংসকারী কঠোর নিয়ম পসন্দ করবে না বরং ঘৃণা ও বিরক্তিতে উহাকে প্রতিরোধ করার জন্যে কোন চেষ্টা ও উপায় উদ্ভাবনের অন্বেষণ করবে। সুতরাং যুগ সর্বদা এক প্রকার থাকে না। অতএব বিজয়ীকে বিজয় লাভ করার সময়ে বিজিতের ওপরে করুণা করা বিজিতকে উহার পরাজয়ের সময়ে নিজের ওপরে দয়া করার খাতিরে আহ্বান জানানোর জন্যে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। কমপক্ষে বিজিত সরকার যেন সন্ধির হস্তকে সম্প্রসারিত করে, আর যদি শর্ত সাপেক্ষ সন্ধির প্রস্তাবের ঘোষণা হয় তাহলে সৌভাগ্য মনে করে সন্ধি করা উচিত। এ বিষয়ে কুরআনের কতইনা প্রজ্ঞাপূর্ণ ও নিরাপত্তাপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে যে, শত্রু যদি সন্ধির জন্যে বিনত হয় তাহলে সেজন্যে ত্বরিৎ বিনত হওয়া উচিত (সূরা আনফাল : ৬২ আয়াত)।

৩। সুস্থ-বুদ্ধি ও সুস্থ-স্বভাবও যদি ঐশী-শিক্ষা এবং ধর্মীয় আলোকে দুনিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রেখে চিন্তা করে, তাহলে সন্ধি-চুক্তি যখনই এক পক্ষ থেকে পেশ করা হয় তখন তখনই অন্য পক্ষ থেকেও এগিয়ে আসা বাঞ্ছনীয় ; নচেৎ সন্ধির ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ জারী রাখাই বুঝায়। তবে ইহা জ্ঞান-মূলক প্রচেষ্টা বা সুস্থ বুদ্ধির অনুসরণের অর্থে নয় বরং ইহা এক প্রকার পশু ও বর্বরের বর্বরোচিত আবেগের কেবল প্রতিশোধমূলক প্রেরণার বহিপ্রকাশ আর এ পর্যন্তই। হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের কথাই ধরুন না কেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে পশুত্বের আবেগ এবং জিদ ও ক্রোধের প্রেরণা চরমে পৌঁছে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বিপক্ষকে ধ্বংস ও বিনাশ সাধন না করে ছাড়ে না। এ অবস্থাই এসব পশুতুল্য মানুষদের। তাদের যুদ্ধ কোন নিরাপত্তা এবং সন্ধির উদ্দেশ্যে হয় না, আর কোন ফেতনা-ফাসাদকে দূরীভূত করার উদ্দেশ্যেও নয়। বরং এজন্যে হয়ে থাকে যে, এখন আমাদের নিকট যুদ্ধ ও লড়াইয়ের জন্যে প্রচুর ও ঢের যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম মজুদ আছে। আর পরাজিত সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে আমাদের বশ্যতা স্বীকার না করে এবং এ উদ্দেশ্য লাভে পথের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা যতক্ষণ আমরা অপসারিত করতে সক্ষম না হই যুদ্ধ বন্ধ হতে পারে না বরং যুদ্ধ চলতেই থাকবে। অবশ্য যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম

যতক্ষণ হাতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকবে। এ দৃষ্টিভঙ্গি কি সংশোধনের মুখাপেক্ষী নয়? যদি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে এবং সংশোধনের মুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে উহার বিপর্যয় অবধারিত সে ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কে? ধর্ম না বুদ্ধি? ইহা সুস্পষ্ট যে, এই বিশ্ব-যুদ্ধ যা গোটা বিশ্বকে বিরান করে দিয়েছে এবং স্বৈরাচারীগণ ও পথ-প্রদর্শক নেতৃবৃন্দ ধর্মকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিশ্বের দিকে দিকে যুদ্ধের অগ্নি-শিখা প্রজ্জলিত করেছে যা বাড়তে বাড়তে এক বিশ্বকে উহার ইন্ধন বানিয়ে ছাই করে দিয়েছে। এতদ্দ্বারা বুদ্ধির নাম ও বুদ্ধি-বুদ্ধি করে সোচ্চার ব্যক্তিগণ হয়তবা জেনে থাকবেন যে, ধর্মীয় সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণেই বুদ্ধির প্রবক্তাগণ এ খেলায় মেতে উঠে।

বিশ্বের আবাদ অঞ্চলগুলোর বিরান হওয়া ও আবাদ শহরগুলো ও দেশগুলোর বিনাশ, ও ধ্বংস, ভয়ংকর দৃশ্যাবলী ও আতঙ্ক সৃষ্টিকারী দৃশ্যসমূহ এবং ভীতি সঞ্চারকারী আবাদশূন্যতার কারণে এ জড়-বুদ্ধি পরিচালিত পথ-ভ্রষ্টতাপূর্ণ প্রস্তাবসমূহ এবং বিপর্যয়মুখী চেষ্টা-প্রচেষ্টাসমূহের ওপরে শোক প্রকাশ করছে। কিন্তু এ চিৎকার এবং মহাপ্রলয়ংকরী দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও আহমদীগণই, কেবল আহমদী জামাতই একমাত্র রয়েছে যারা বর্তমানে সময়ের (প্রেক্ষাপটে) মহা প্লাবনের ধ্বংস থেকে নূহের নিরাপদ তরীতে অবস্থান করছে এবং এ নির্দেশ—আল্লাযীনা আমানু ওয়া লাম ইয়ালবিসূ আইমানাহুম বিযুলমিন উলায়েকা লাহুমুল আমানু অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে ও নিজেদের ঈমানকে অন্যায়ের সাথে মিশ্রিত করেনি এরাই এমন লোক যে, তাদের জন্যে নিরাপত্তা নির্ধারিত আছে (সূরা আনআম: ৮৪ আয়াত)। অনুযায়ী কেবল খোদা ও তাঁর রসূলের ওপরে সত্যিকারের ঈমান আনয়ন করায় এবং তাঁর উপস্থাপনকৃত ইলহাম ও ধর্মীয় শিক্ষার ওপরে আমল করার কারণে নিরাপত্তার মাকাম ও মার্গে অবস্থান করছে। আযাবের পরে আযাব এসেছে এবং আসছে। সাধারণ ধ্বংস শাস্তি দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস ও বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছে, জাতির পর জাতি যুগের যাঁতাকলের তলায় পিষ্ট হচ্ছে এবং ক্ষতির পরে ক্ষতি বরদাশ্ত করছে; কিন্তু জামাতে আহমদীয়াই সর্বপ্রকার ক্ষতি থেকে সংরক্ষিত। বরং উন্নতির পর উন্নতি এবং কল্যাণের পর কল্যাণ লাভ করে যাচ্ছে। এ যুগে কি কোন সমাঝদারের জন্য এসব পরীক্ষা এবং বিপদ-আপদে বিশ্বের নিরাপত্তার উপকরণকে হৃদয়ঙ্গম করা এবং কেবল বুদ্ধির অনুসারীদের প্রতিফল ও ধর্মের পথ-নির্দেশনা ও অনুসরণের প্রতিদানের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য যদি দেখতে চায় তাহলে দেখতে কি পারে না? প্রত্যেকের ফলাফলই উন্মোচিত এবং প্রত্যক্ষভাবে সামনে মজুদ রয়েছে। আবার ইহা বাস্তবিক নয় আধ্যাত্মিক এবং গোপনীয়ও নয় বরং দৃশ্যমান এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে অবহত বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এ যুগ বুদ্ধির

ত্রুটিসমূহ দেখিয়ে দিতে এবং ধর্মের কল্যাণসমূহ ও সৌন্দর্যসমূহ প্রকাশ করার জন্যে আশ্চর্য যুগ। এর দৃষ্টান্ত পূর্বে কখনও পাওয়া যায় নি। কল্যাণমণ্ডিত ঐ সব লোক যারা সুস্পষ্ট পার্থক্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

৪র্থ প্রশ্ন: বিগত যুগে ধর্মীয় লোকগণ পৃথিবীর কী পথ প্রদর্শন করেছেন?

উত্তর: ১) খোদাতা'লার নবী ও রসূলগণের যুগের অবস্থা ও ঘটনাবলীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো নবুওয়ত ও রেসালতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং তদনুযায়ী আকৃতি ধারণ করা। প্রত্যেক নবী ও রসূল খোদাতা'লার ওহী ও ইলহামের দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং নিজের ধর্মীয় শিক্ষা দ্বারা লোকদের ধর্মীয় বিশ্বাস, আমল ও চরিত্রের সঠিক মূল্যায়নের জন্যে নিজের আদর্শ চরিত্রকে উপস্থাপন করেন। আর ইফরাত (বাড়িয়ে বলা) ও তফরীত (কমিয়ে বলা) দূরীভূত করে নিজের জামাতকে যা কিনা ঈমান আনয়নে ও উপস্থাপনকৃত শিক্ষার ওপরে আমল করার জন্যে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাসীসুলভ নিষ্ঠার আদর্শ উপস্থাপন করে শত মিতাচারের ওপরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। এবং এভাবে প্রত্যেক নবী-রসূল পৃথিবী থেকে কুফরী এবং দুষ্কর্ম ও পাপাচারের দুর্গন্ধ কিছু জামাতের পবিত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা দূরীভূত করেছেন আর কিছু কাফেরদের ধ্বংস ও বিনাশ সাধনের দ্বারা খোদার শাস্তিসমূহ পৃথিবীতে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি করেছেন।

বিগত যুগে ও অতীতকালে প্রত্যেক নবী ও রসূলের ওপরে বিশ্বাস আনয়নকারীগণ ধর্মের মাধ্যমে দুনিয়ার সৌন্দর্য ও পরকালের সৌন্দর্য লাভের সফলতাসমূহ অর্জন করেছেন এবং নিরাপদেও আছেন। আর সত্য ধর্মের ও ইলহামী শিক্ষার বৈরীগণ সর্বকালে ও সর্বযুগে রসূলের বিরোধিতায় বড় ব্যাপকতা দান করেছে এবং কেবলমাত্র শাস্তি, ধ্বংস, বিনাশ ও মিটে যাওয়া ছাড়া আর কিছু লাভ করে নি। নিজেরাও ধ্বংস হয়েছে এবং অন্যান্যদেরকেও ধ্বংস করেছে। এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, অতীত যুগে নবী-রসূলগণের বিরোধিতায় যে ফল প্রকাশিত হয়েছে তাথেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি?

কুরআনের—হাল আতাকা হাদীসুল জুনূদ ফির'আওনা ওয়া সামূদ আয়াতের আলোকে ফেরাউনের একনায়কত্ব ও সামূদ জাতির গণতন্ত্রের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে উভয়েরই শেষ পরিণতি—যা কিনা ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ফলে প্রকাশিত হয়েছে—বর্ণনা করে দিয়েছে।

(২) প্রকৃতপক্ষে আরাম-আয়েশের জীবনের সাথে স্বেচ্ছাচারী জংলী আবেগের অভিব্যক্তি সঠিক ব্যবস্থাপনা বা ঐশী শিক্ষার বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্ত রাখার প্রত্যাশী। আর এর কারণ এই যে, প্রত্যেক নবী-রসূলের আবির্ভাবে যে সঠিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে মর্তের সন্তানগণ এ ধর্মীয় ব্যবস্থাপনাকে নিজস্ব স্বাভাবিক স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচরিতার বিরোধী

দেখে উহার শত্রুতে পরিণত হয় এবং উহার মূল্যোৎপাটন করতে সচেষ্ট হয়। আর তাদের বিপথ-গামিতা এবং খোদার রসূলগণের ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার দৃষ্টান্ত অবিকল এমনই হয়ে থাকে যেমন ডাকাত, চোর ও বদমায়েশদের দল এবং সরকারী প্রশাসনের। সরকারী ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য এই হয়ে থাকে যে, পৃথিবীতে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার খাতিরে নিয়ম ও রাজনীতি ও সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকুক। কিন্তু চোর, ডাকাত ও বদমায়েশরা ইহা চায় না যে, সরকার যা কিনা স্বীয় ব্যবস্থপনা ও ব্যবস্থাপনার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে লোকদেরকে রক্ষা করতে চায়, তাদের জন্যে শাস্তির বিধি-বিধান প্রবর্তন করে এবং এথেকে বদমায়েশদের প্রতিহত করে। এর কারণ ইহাই যে, এসব বদমায়েশদের ধ্বংসপ্রাপ্ত স্বভাব এতটুকুও উপলব্ধি করে না যে, উত্তম চরিত্র বলতে কী বুঝায় এবং মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও উহার উত্তম দৃষ্টান্ত ধর্মীয় ঐশী-শিক্ষা ব্যতিরেকে লাভ হতে পারে না।

(৩) সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা যা কিনা ঐশী ইলহামের মাধ্যমে দুনিয়াতে উপস্থাপন করা হয়, মানবকে আধ্যাত্মিকতার বিশাল সমুদ্র পাড় করার এবং তাকে খোদা পরিচিতির সাতারু ও ডুবুরীর মাধ্যমে খোদার সাথে কথোপকথন লাভের অধিকারী ও নৈকট্যপ্রাপ্ত বানিয়ে দেয়। ইহা পার্থিব জগতের লোকেরা বুঝতে অপারগ।

এ শিক্ষার প্রত্যেকটি দিকের প্রেক্ষাপটে এ একনায়ক ও জাতীয় নেতা বলে কথিত এবং ধর্মের ওপরে প্রশ্নবান নিক্ষেপকারীরা সত্যিকার দলিল-প্রমাণাদি ও সঠিক আত্মাভিমান ও কুরবানী এবং উৎকৃষ্টতর ফলসমূহের মোকাবেলা করতে পারে না। তর্কবিদদের ভ্রান্ত যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের ন্যায় এবং দর্শন-শাস্ত্রবিদদের ত্রুটিপূর্ণ ও জড় দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বাহ্যদর্শীদের ধোঁকা দিয়ে দেয়া অন্য কথা ; কিন্তু নবী-রসূলগণের পবিত্র শক্তি ও ইসলামী পথ-নির্দেশনা যদ্বারা নৈরাশ্য-জনক অবস্থাসমূহ ও ঘটনাবলীর জঞ্জালসমূহ ও বালুকাময় প্রান্তরসমূহ অতিক্রম করাকালীন ঐশী সুসংবাদের আলোকে খোদাতা'আলার নবী ও রসূল স্বীয় জামাত সহ সফলতার মঞ্জিলে গিয়ে পৌঁছে। তাদের দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করলে মর্তের সন্তানদের মধ্যেও কি তা পাওয়া যেতে পারে ?

৪) স্থির বুদ্ধি ও সঠিক স্বভাব স্বভাবের স্রষ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে এবং বিশ্ব-ব্যবস্থা-পনার পরস্পর গঠন প্রণালী ও বিন্যাস নিজের জন্য নিজের অনুগ্রহপরায়ণ স্রষ্টার তরবীয়তের উপকরণ ও অনুগ্রহসমূহের কারণে সাহায্য-সমর্থন ও কল্যাণ লাভ করার উপলব্ধি রাখে।

খোদার নবী ও রসূল যে ঐশী শিক্ষা উপস্থাপন করে থাকেন এর মধ্যে আল্লাহ্‌র হক ও অধিকার এবং বান্দার হক ও অধিকার বা আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি মমতার উভয় বিষয়ের ওপরেই পরিপূর্ণভাবে আলোক সম্পাত করে থাকে।

ইসলামী শিক্ষার আলোকে হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত ও উৎকৃষ্ট আদর্শ ঐ মর্যাদার সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, মানবের হক ও অধি-

কারসমূহ বাদে সাধারণ জানোয়ার ও প্রাণীকুলের সাথে মমতাপূর্ণ ভাল ব্যবহার করার শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে। সুতরাং যেখানে—ইউত্বি'ইমূনাত্তা'আমা'আলা হুব্বিহি মিসকিনাওঁয়া ইয়াতীমা ওঁয়া আসীরা এর মর্মানুসারে মমতাপূর্ণ আচরণের সাথে গরীবদের, এতীমদের এবং কয়েদীদের যে আর্থিক কষ্টের অবস্থায় ক্ষুধায় খাদ্যের প্রত্যাশী হয় ঐসব কেবল ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে, অভাবী ও ভিখারী লোকেরা আমাদের আল্লাহ্‌র বান্দা। সামর্থ্য ও শক্তি অনুযায়ী তাদেরকে খাবার যোগায়। এতদ্ব্যতিরেকে যেন—ওয়া ফী আমওয়ালিহিম হাক্কুলিস সাইলি ওয়াল মাহরুম —আদেশের প্রেক্ষিতে প্রাণীদের, যারা মুখ দিয়ে নিজেদের অবস্থার বর্ণনা করতে পারে না এ ব্যাপারে একজন মুসলমানের জন্যে ইসলামের নির্দেশ ও শিক্ষার আলোকে তাদেরকেও নিজের অর্থ-সম্পদের অধিকারী মনে করে তাদের পাওনা আদায় করা আবশ্যক। সুতরাং ইমাম বুখারী এ রকম শিক্ষা উপস্থাপন করার উদ্দেশ্য দৃষ্টান্তস্বরূপ এক মহিলার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে যে, তিনি একটি পিপাসার্ত কুকুরকে, যে কঠিন পিপাসায় কাতর হয়েছিলো—কুয়ো থেকে পানি উঠিয়ে পান করিয়েছিলেন। আর তার এ কর্ম তার স্রষ্টা ও অনুগ্রহশীল খোদা এতই পসন্দ করেন যে, ঐ মহিলার মুক্তি ও সফলতার কারণ ঐ কর্মকেই বানিয়ে দেন।

এমনিভাবে ইসলামী শিক্ষার মধ্যে কঠোর ও কঠিন অন্তরের কষ্টদায়ক আচরণ মানুষ বাদে জন্তু জানোয়ারের সাথেও করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং সহীহ বুখারীতে কেবল এভাবেই কঠোরতা ও কাঠিন্য থেকে বাধা দেয়ার জন্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এক মহিলা বিড়ালকে আবদ্ধ করে রাখার কারণে খাবার ও পানীয় না দেয়ার ব্যাপারে এমন কঠোরতা ও কাঠিন্যের আচরণ করেছে যে, শেষ পর্যন্ত বিড়ালটি কষ্টের চোটে হাপাতে হাপাতে মারা যায় এবং খোদাতা'আলা নিজের সৃষ্ট বিড়ালের ওপরে এরূপ কঠোরতা অপসন্দ করে ঐ মহিলার ওপরে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে দোযখে নিক্ষেপ করার আদেশ দেন।

এখন এ শিক্ষা এবং এরূপ পরিপূর্ণ ও ব্যাপক শিক্ষা যা কিনা নবী রসূলগণের মাধ্যমে দুনিয়াতে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে, অত্যাচারী একনায়ক, বিধর্মী ও অত্যাচারী নেতা যারা স্বীয় উদ্দেশ্য, আত্ম-তুষ্টি ও আত্মম্ভরিতাকে আসল লক্ষ্য ব্যতিরেকে আর কিছুই মনে করে না। আত্ম-প্রশংসা ও নিজস্ব জৌলুশ ব্যতিরেকে তাদের কোন উদ্দেশ্য নেই। এসব লোক কি জানে যে, ঐশী-শিক্ষার ওপরে ভিত্তি করে উপস্থাপিত উজ্জ্বল ধর্মাদর্শ ও সত্য ধর্ম বলতে কী বুঝায়?

পরিশেষে দোয়া করছি যেন আল্লাহ্‌তা'আলা বর্তমান যুগের লোকদের চক্ষু উন্মোচন করে দেন। তারা যেন ধর্মের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। আবার সঠিক ধর্ম গ্রহণ করে খোদা-তা'আলার সন্তুষ্টিভাজন হয়।

আমাদের সর্বশেষ দোয়া এই যে, সকল প্রশংসা সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যে নিবেদিত। (১১-৭-৯৭ ও ২৯-৮-৯৭ তারিখের ইন্টারন্যাশনাল আল্‌ ফযলের সৌজন্যে)

খতমে নবুওয়ত ও আহমদীয়া জামাত

মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর, লায়েলপুরী

ভাষান্তর—এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার (মরহুম)

(চতুর্থ কিস্তি)

(৬)

হযরত ইমাম আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী আলায়হের রহমত লিখিয়াছেন :—

فان مطلق النبوة لم ترتفع و انما ارتفع نبوة التشريع - (اليواقيت والجواهر - صفحة ٢٨ - بحث ٣)

অনুবাদ :

"সুতরাং, কোন সন্দেহ নাই যে, শুদ্ধ সাধারণ নবুওয়ত (মুৎলাকা নবুওয়ত) উঠিয়া যায় নাই—কেবলমাত্র শরীয়তবাহী (তশ্‌রীয়ী) নবুওয়ত বন্ধ হইয়াছে" (আল্‌-ইউওয়াকিতু ওআল্‌জাওয়াহের)।

অতঃপর বলিয়াছেন :

وقوله صلى الله عليه وسلم لا نبى بعدى و لا رسول المراد به لا لمشرع بعى -

অর্থাৎ, "রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হাদীস 'আমার বাদে নবী বা রসূল নাই'- দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, তাঁহার পরে শরীয়তদাতা কোন নবী নাই" (ঐ)।

(৭)

আরেফে রাব্বানী সৈয়্যদ আবদুল করীম জিলানী আলায়হের রহমত বলেন :—

فانقطع حكم نبوة التشريع بعده وكان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لانه جاء بالكمال ولم يجى احد بذالك -

(الانسان الكامل باب ٣٦ - جلد اول صفحة ٧٦)

অনুবাদ :

"আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পর শরীয়তবাহী (তশ্‌রীয়ী) নবুওয়তের আদেশ বন্ধ হইয়াছে এবং এই হিসাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম খাতামুন্নাবীয়ীন যেহেতু তিনি পূর্ণ শরীয়ত সহ আসিয়াছেন এবং এইভাবে পূর্ণ শরীয়ত সহকারে আর কেহই আগমন করেন নাই" (ইন্‌সানুল কামেল)।

(৮)

সুবিখ্যাত সূফী হযরত মৌলানা রুমী আলায়হের রহমত লিখিয়াছেন :—

مکر کن در راہ نیکو خدمتے
تا نبوت یابی اندر امتی

অর্থাৎ, "খোদার পথে পুণ্যার্জনের এমন চেষ্টা কর, যেন উম্মতের মধ্যে নবুওয়তের অধিকারী হইতে পার" (মস্‌নবী)।

(৯)

হযরত সৈয়্যদ ওলীউল্লাহ শাহ্ দেহলবী আলায়হের রহমত বলেন :—

ختم بہ النبیون ای لا یوجد من یامرہ اللہ سبحانہ بالتشریع علی الناس
(تفہیمات - الہیہ تفہیم ۳۵)

অর্থাৎ, "আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দ্বারা নবুওয়ত খতম হইয়াছে। অর্থাৎ, তাঁহার পর এমন কোন নবী আগমন করিবেন না, যাঁহাকে খোদাতা'আলা শরীয়ত দিয়া লোকের প্রতি 'মামুর' করিবেন।" (তফ্‌হীমাতে ইলাহীয়া)

(১০)

হযরত মৌলবী আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবি ফিরিঙ্গী মহল্লী বলেন :—

بعد انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا زمانہ میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے مجرد کسی نبی کا ہونا محال نہیں بلکہ حسب شرع جدید البتہ ممتنع ہے -
(دافع الوسواس فی اثر ابن عباس ایدیسی جدید - صفحہ ۱۲)

অনুবাদ :

"আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পর, কিংবা তাঁহার সময়ে কাহারো শুধু নবী হওয়া অসম্ভব নহে। পরন্তু নূতন শরীয়তধারী নবীর আগমন অসম্ভব" (দাফেউল ওস্‌ওয়াস)।

(১১)

নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ সাহেব বলেন :—

حدیث لا وحی بعد موتی بے اصل ہے - ہاں لا نبی بعدی ایسا ہے - اس کے
معنی نزدیک اہل علم کے یہ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی شرع ناسخ نہیں لائے گا -
(اقتراب الساعۃ - صفحہ ۱۶۲)

অনুবাদ :

"আমার মৃত্যুর পর কোন ওহী নাই"—হাদীসের কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য, 'আমার পরে কোন নবী নাই' বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানীদের নিকট ইহাই অর্থ, 'আমার পর শরীয়ত রহিতকারী কোন নবী আসিবে না" (একতরাবুসসা'আ)।

(১২)

হযরত মৌলবী মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী সাহেব (রহঃ) (দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা) বলেন :—

"عوام کے خیال میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا پایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء کے سابق کے زمانہ کے بعد آپ سب میں آخری نبی ہیں - مگر اہل فہم پر روشن ہو گا کہ تقدم و تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں - پھر مقام مدح میں ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے - (تحذیر الناس - صفحہ ۳)

অনুবাদ :

অর্থাৎ, "সর্ব-সাধারণের ধারণানুসারে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম 'খাতামুন্নাবীয়ীন' হওয়ার অর্থ এই যে, তাঁহার যুগ সকল নবীর পরে এবং তিনি সকল নবীর শেষ। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট দেদীপ্যমান সত্য যে, সময়ের অগ্র পশ্চাতের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। সুতরাং, প্রশংসাস্থলে "ওয়া লা-কিরসূলাল্লাহি ও খাতামান্নাবীয়ীন" (কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসূল ও খাতামান্নাবীয়ীন) বলা কীভাবে যথার্থ হইতে পারে (তহ্‌যিরুন্‌নাস) ?

অন্য কথায়, "খাতামান্নাবীয়ীন"-এর অর্থ মওদুদী সাহেবের ন্যায় শুধু শেষ নবী করা, তাঁহার মতে সাধারণ লোকের কৃত অর্থ এবং ইহা বিচারশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কৃত অর্থ নয়।

অতপরঃ তিনি 'খাতামান্নাবীয়ীন'-এর অর্থ করিয়াছেন :—

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم موصوف بوصف نبوۃ بالذات ہیں اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض ہیں - اوروں کی نبوت آپ کا فیض ہے - مگر آپ کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں - اس طرح آپ پر سلسلہ نبوت مختتم ہو جاتا ہے - غرض جیسے آپ نبی اللہ ہیں ویسے ہی نبی الانبیاء ہیں" - (تحذیر الناس - صفحہ ۳ و ۴)

অনুবাদ :

"আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নবুওয়তের মৌলিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন, অন্যান্যগণের নবুওয়ত তাঁহার কল্যাণপ্রসূত, কিন্তু তাঁহার নবুওয়ত অন্যের কল্যাণে নয়। এই প্রকারে তাঁহার উপর নবুওয়তের সেলসেলা মোহরাবদ্ধ হইয়া যায়। বস্তুতঃ, তিনি যেমন আল্লাহ্‌র নবী, তেমনি নবীগণেরও নবী" (তহ্‌যিরুন্‌নাস)।

অন্য কথায়, খাতামুন্নাবীয়ীন অর্থ "নবীগণের নবী"। এ কথা পরিচায়ক যে, খাতামুন্না-বীয়ীন সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের গুণ মৌলিক এবং তিনি ভিন্ন অন্যান্য নবীগণের নবুওয়তের গুণ অমৌলিক। অর্থাৎ, অন্যান্য নবীগণের নবুওয়ত তাঁহার কল্যাণেপ্রাপ্ত। এই অর্থের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তিনি বলেন :

"بالفرض اگر بعد از زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ و سلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئیگا"۔

(تحذیر الناس - صفحہ ۲۸)

অর্থাৎ "বস্তুতঃ, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পরেও যদি কোন নবী পয়দা হন, তথাপি মুহাম্মদী খাতামিয়তে কোনই পার্থক্য ঘটিবে না" (তহ্‌যিরুন্‌ নাস)

এই হইল সর্বজনমান্য বার জন বুযুর্গের উক্তি। ত্রয়োদশ বুযুর্গ ইমাম রাগেব আলায়হের রহমতের উক্তি আমরা ইতোপূর্বে উপস্থিত করিয়াছি। এই তেন জন বুযুর্গ ধর্ম-জ্ঞান, বিচার-ক্ষমতা এবং ঐশী-প্রেমে মগ্ন হওয়ার দিক দিয়া এমন উচ্চ ও মহান যে, মওদুদী সাহেবের ন্যায় উলামা তাঁহাদের পাদুকা বহনে গৌরবানুভব করিবেন। এই উজ্জ্বল নক্ষত্রগণের যুগ সাহাবাগণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। হেজায, সিরিয়া, তুর্কি, ইরাক, স্পেন এবং ভারতবর্ষের ইঁহারা সুপ্রসিদ্ধ বুযুর্গ।

১। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিআল্লাহু আনহা (মৃত্যু ৫৮ হিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হাদীস অনুসারে 'ধর্মের অর্ধাংশের শিক্ষয়িত্রী' বলিয়া পরিচিত।

২। ইমাম রাগেব আল্‌ ইস্পাহানী রহমতুল্লাহে আলায়হে (মৃত্যু ৫০২ হিঃ) কুরআন করীমের আভিধানিক জ্ঞানের ইমাম। তাঁহার কেতাব 'আল্‌ মুফ্‌রাদাত' কুরআন মজীদের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য অতুলনীয় অভিধান।

৩। শেখ আকবর হযরত মুহিউদ্দীন ইব্‌নুল আরাবী আলায়হের রহমত (মৃত্যু ৬০৮ হিঃ)।

৪। হযরত মৌলানা জালালুদ্দীন রুমী আলায়হের রহমত (মৃত্যু ৬৭২ হিঃ)।

৫। পীরানে পীর হযরত সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী আলায়হের রহমত কুদ্দুসু সির্‌রুহু (ওফাত ৫৬২ হিঃ)।

৬। হযরত সৈয়্যদ আব্দুল করীম জিলানী আলায়হের রহমতের (ওফাত ৭৬৭ হিঃ)

৭। ইমাম আবদুল ওয়াহহাব আশ্‌শা'রানী আলায়হের রহমত (ওফাত ৯৮৬ হিঃ)।

৮। ইমাম মুহাম্মদ তাহের আলায়হের রহমত (ওফাত ৯৮৬ হিঃ)।

নোট :—৩-৮ এই ছয় জন বুযুর্গ তাসাউফ শাস্ত্রের ইমাম এবং ধর্মজ্ঞানে উম্মতের জ্ঞানীদের শীর্ষ স্থানীয়। হযরত পীরানে পীর ষষ্ঠ শতাব্দীর মুজাদ্দেদও ছিলেন।

৯। আল্‌ ইমাম আলী আল্‌ কারী আলায়হের রহমতে (ওফাত ১০১৪ হিঃ)।

তিনি হানাফী ফেকাহের মহামান্য ইমাম এবং হাদীসের অসাধারণ ব্যাখাবিদ্।

১০। হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ সাহেব মুহাদ্দেস দেহলবী আলায়হের রহমত (ওফাত ১১৭৬ হিঃ)। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ এবং ইসলামের মুতাকাল্লিম ছিলেন।

১১। হযরত মৌলবী আবদুল হাই সাহেব লক্ষ্ণৌবী আলায়হের রহমত (ওফাত ১৩০৪ হিঃ)।

১২। হযরত মৌলবী মুহাম্মদ কাসেম সাহেব নানুতুবী আলায়হের রহমত, দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা (ওফাত ১৩০৭ হিঃ)।

এই দুই জনই ভারতবর্ষে হানাফী ফেকাহের মহামান্য উলামা ছিলেন।

১৩। নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ সাহেব ভুপালবী (ওফাত ১৩০৭ হিঃ)। ইনি ভারতবর্ষের আহলে হাদীস উলামাগণের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন। তাঁহার তফসীর 'ফাৎহুল বায়ান' আরবী ভাষায় মিশরে মুদ্রিত হইয়াছে।

এই তেরজন বুযুর্গ 'খাতামুন্নাবীয়ীন' আয়াত এবং 'লা নাবীয়া বাদী' প্রভৃতি হাদীস দ্বারা যে প্রকার নবুওয়ত বন্ধ হইয়াছে তাহার এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পর কোন শরীয়তদাতা ও স্বাধীন নবী আসিতে পারেন না। তাঁহাদের মতে, 'উম্মতী নবীর' আগমন 'খতমে নবুওয়তের' বিরোধী নয়। সুতরাং, তাঁহারা সকলেই মসীহ মাওউদকে 'উম্মতি নবী' বলিয়া স্বীকার করেন। (চলবে)

(৩১ পাতার অবশিষ্টাংশ)

এ অবস্থা হতে মুক্তি পেতে হলে ফাদার বা গড ফাদার যে-ই হউক না কেন সবাইকে 'গুড্ ফাদার' অর্থাৎ সুপিতা হতে হবে। এজন্য নিজে ভাল হতে হবে, সন্তানদেরকে ভাল পথে চলার জন্য সদা তাগিদ দিতে হবে। একক চেষ্টায় তা সীমিত রাখলে চলবে না। সুসংগঠিতভাবে এগোতে হবে। স্মরণীয় যে, বর্তমান অবক্ষয়ের হোতারা খুবই সংগঠিত। তাদের চেয়ে বড় ও ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাতে পারলেই তারা কাবু হবে। সর্বোপরি এ প্রচেষ্টায় মানুষের প্রতি সদিচ্ছা এবং সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে। এজন্য ঐশী নির্দেশে পরিচালিত জামাতের সাথে সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক। এ যামানাতে আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত ইমাম মাহদী মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতই সেই জামাত। এতে উপরে উল্লেখিত গড ফাদার ও মস্তানদের কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে সব পিতারাই সুপিতা তথা গুড ফাদার হওয়ার এবং সব সন্তানেরই সুসন্তান হওয়ার সাধনা করে চলেছে।

পৃথিবীটা বড্ড পীড়িত

'গড ফাদার' বনাম 'গুড ফাদার'

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

মূলতঃ ইংরেজী হওয়া সত্ত্বেও আজকাল বাংলায় বহুল ব্যবহৃত দুটো শব্দ হলো 'গড ফাদার'। বস্তুতঃ এ শব্দ দুটো বাংলায় স্থান করে নিয়েছে। খৃষ্ট ধর্মের প্রচলিত নিয়মে কোন শিশুর দীক্ষা নেয়া বা পবিত্র বারিতে অভসিঞ্চিত করাকে ব্যাপটাইজ (Baptize) বলা হয়। এ অনুষ্ঠানের প্রথা মতে যাকে দীক্ষা দেয়া হয় তার মংগলামংগলের প্রতি নযর রাখার জন্য কোন নারী বা পুরুষকে 'গড মাদার' বা 'গড ফাদার'রূপে অর্থাৎ 'ধর্ম মাতা' বা 'ধর্ম পিতা' ঘোষণা দেয়া হয়। 'গড' শব্দ দ্বারা ঈশ্বর বা দেবতাও বোঝাতে পারে। 'ফাদার' শব্দটি অনেক অর্থ ও তাৎপর্য বহন করে। যেমন পিতা, বাবা, জনক, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, প্রবর্তক ; শ্রদ্ধেয় বা ধার্মিক পুরুষ অথবা যাজকদের আখ্যা বিশেষ। বৃদ্ধলোককে সম্বোধন কালে প্রীতি বা ভদ্রতাসূচক আখ্যা বিশেষ। শাসক গোষ্ঠীর অন্যতম হলো 'সিটি ফাদার' (নগর পিতা)। সব মিলিয়ে দেখলে গড ফাদার শব্দদ্বয় সম্মান এবং পবিত্রতার শুভ ইংগিত বহন করতো। বর্তমানে কিন্তু এই উপমহাদেশে মোটেও তা করে না। বরং তা বিপরীত তথা অশুভের মজবুত বাহনরূপে পরিচিতি লাভ করেছে। এখন গড ফাদার সমাজের উঁচুস্তরের লোক দ্বারা কালোবাজারী, মজুদদারী, বিশেষ করে সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতা লালনকারীদেরকেই বোঝায়। বাংলাভাষাতে ইতোমধ্যে আর একটি শব্দের তাৎপর্যও বিপরীত রূপ ধারণ করেছে। শব্দটি হলো 'মস্তান'। এর একাধিক অর্থ ছিলো যেমন, ঐশী প্রেমে মত্ত, ভাবে উন্মত্ত, দেওয়ানা, বিবাসী, প্রেমপাগল। মস্তানী-মস্তানদের কাজ। পরিবর্তিত অর্থ হলো গুণ্ডাগিরি, দাদাগিরি ইত্যাদি। অর্থাৎ শব্দটিতে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ ও তাৎপর্য ধারণ করানো হয়েছে। বর্তমানে গড ফাদার ও মস্তানরা মূল দায়িত্ব পালন হতে বিরত থাকে না বরং সম্পূর্ণ বিপরীত কর্ম করে থাকে। তারা নিজেদের মাঝে দৃঢ় আঁতাত করে অবক্ষয়ের ধারক ও বাহকরূপে সমাজকে জর্জরিত করছে। তাতে সমাজ হতে সুখ শান্তি বিদায় নিচ্ছে, মানবতা হাঁপিয়ে ওঠছে। দেশের উন্নয়নে অগ্রগতি, দারিদ্র বিমোচনের প্রয়াস পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। অপর দিকে গড ফাদার ও তাদের লালিত সন্ত্রাসীরা কাল টাকার পাহাড় জমায়। বর্তমানে চারিদিকে ঐ অবস্থায়ই বিরাজ করছে।

(অবশিষ্টাংশ ৩০ এর পাতায় দেখুন)

কুরআনী জিন্দেগী

সংকলক : খোন্দকার আজমল হক

(তৃতীয় কিস্তি)

৩। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সবাই স্বীকার করে যে, স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্।

কুরআন

৯। এবং যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশমালা এবং পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন ? তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্'। তুমি বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৩১ : ২৬) 'ক' *

১০। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু আদম সন্তানগণের নিকট হতে তাদের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধর গ্রহণ করলেন এবং তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী দাঁড় করালেন (এই বলে যে), আমি কি তোমাদের প্রভু নই ? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। (তিনি এটা এজন্য করেছেন) পাছে তোমরা কিয়ামত দিবসে না বল, 'আমরা এ সম্বন্ধে গাফেল ছিলাম'। (৭ : ১৭৩) **

'ক' ৩ : ৮৪ , ২০ : ৮৫-৯১ ; ২৯ : ৬২ , ৩৯ : ৩৯ ; ৪৩ : ৮৮ ।

* বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি পরিকল্পনার মধ্যে যে পরিপূর্ণতা ও পরিপক্কতা দৃষ্ট হয় এবং এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিচালনার যে অনবদ্য শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয় তা যদি বুদ্ধিমত্তা ও মননশীলতার সাথে অনুধাবন করা যায়, তবে যে কোন ব্যক্তি অবশ্যম্ভাবীরূপে এই অনিবার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, এই বিশ্ব-জগতের নিশ্চয়ই একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। বাচনভঙ্গি 'লাইয়া কুলুন্নার' তাৎপর্য এটাই যে, অবিশ্বাসীদের একথা স্বীকার করা ছাড়া কোন গত্যান্তর নেই যে, আল্লাহ্-তা'আলাই এই বিশ্ব-জগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন, (কুরআন মজীদ, টীকা ২৩১৪)

** এই আয়াতে আল্লাহ্তা'আলা যিনি এই বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করেছেন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন, তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে নিহিত প্রমাণের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে (৩০ : ৩১)। অথবা এ-ও হতে পারে যে, এই ইংগিত আল্লাহ্তা'আলার প্রেরিত মহান নবী-রসূলগণের আবির্ভাব সম্পর্কে যাঁরা আল্লাহ্তা'আলার দিকে পথ দেখিয়ে থাকেন। 'আদম-সন্তান' বলতে প্রত্যেক যুগের মানুষকে বুঝান হয়েছে যাদের নিকট আল্লাহ্র নবীগণ আবির্ভূত হন। প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রত্যেক নূতন নবীর আগমনই এই ঐশী-জিজ্ঞাসা নিয়ে আসে, 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই ?' এ প্রশ্নই প্রকাশ করে যে, আল্লাহ্ যখন মানবের দৈহিক জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন এবং একইরূপে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশেরও উপায় সৃষ্টি করেছেন, তখন সে কীরূপে আল্লাহ্র প্রভুত্বকে অস্বীকার করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মানুষই তাদের নবীকে প্রত্যাখান করে নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য বহন করে। কারণ এমতাবস্থায় তারা এই বলে নিষ্কৃতি পেতে পারে না যে, তারা আল্লাহ্তা'আলাকে বা তার বিধানকে অথবা বিচার-দিবস সম্বন্ধে জানত না (কুরআন মজীদ, টীকা ১০৭০)।

হাদীস

৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূলে করীম (সাঃ) যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতেন তখন বলতেন, 'আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হলাম এবং রাজ্য সন্ধ্যায় উপনীত হল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে।' আর যখন সকালে উপনীত হতেন তখন বলতেন, 'আমরা সকালে উপনীত হলাম এবং রাজ্যও সকালে উপনীত হল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে।"

(আবু দাউদ, তিরমীযি)

৬। হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) আল্লাহ্‌তা'আলার এই আয়াত, 'যখন তোমার পরওয়ারদেগার আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তানদের বের করলেন' এর ব্যাখ্যায় বলেন, "আল্লাহ্‌তা'আলা তাদের (উপাদানসমূহ) একত্রিত করলেন এবং তাদের বিভিন্ন রকম করে গড়তে ইচ্ছা করলেন, অতঃপর তাদের যেভাবে পূর্ণ আকৃতি দান করলেন এবং তাদের কথা বলার শক্তি দিলেন, সুতরাং তারা কথা বলতে পারল, অতঃপর আল্লাহ্‌তা'আলা তাদের নিকট হতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন এবং তাদেরকে নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষী করলেন, (তাদের জিজ্ঞাসা করলেন) আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তারা বলল, হ্যাঁ, অতঃপর আল্লাহ্‌ বললেন, 'আমি তোমাদের একথার উপর সাত আসমান ও সাত যমীনকে সাক্ষী করছি এবং তোমাদের পিতা আদমকেও সাক্ষী করছি, যেন তোমরা কাল কিয়ামতের দিন একথা বলতে না পার, 'ইহা আমরা জানতাম না।' তোমরা জেনে রাখ যে, আমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই এবং আমি ব্যতীত তোমাদের কোন প্রতিপালক পরওয়ারদেগার নেই। সুতরাং তোমরা আমার সহিত কাকেও শরীক করিও না। অতঃপর আমি তোমাদের প্রতি আমার রসূলগণকে পাঠাব, তারা তোমাদেরকে আমার এই অঙ্গীকার ও ওয়াদা স্মরণ করিয়ে দিবে। এতদ্ব্যতীত আমি তোমাদের প্রতি আমার কিতাবসমূহ নাযিল করব। তখন তারা বলল, 'আমরা ঘোষণা করছি যে, নিশ্চয় তুমিই আমাদের রব ও মাবূদ। তুমি ব্যতীত আমাদের রব নেই এবং তুমি ব্যতীত আমাদের কোন মাবূদ নেই।" হযরত উবাই বলেন, "তারা তা স্বীকার করল" (মেশকাত-মূল আহমদ)।

মলফুযাত

৩। "তারপর তিনি আপন অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরও একটি প্রমাণ কুরআন শরীফে পেশ করেছেন, 'আলাসতু বিরব্বিকুম ক্বালু বালা' অর্থাৎ (আমি আত্মাদের বললাম,) 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই?' তারা বলল, 'হ্যাঁ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।' এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'আলা সংলাপের মাধ্যমে রূহের প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন। তিনি আত্মার প্রকৃতিতে এই বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, কোন আত্মা প্রকৃতির দিক হতে আল্লাহ্‌তা'আলাকে অস্বীকার করতে পারে না। অস্বীকারকারীরা শুধু তাদের চিন্তায় প্রমাণ না পাওয়ায় অস্বীকার করে।" (ইসলামী নীতি দর্শন)

(চলবে)

কার না কার

(করো, কোর না)

(একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-পুস্তক)

মুল সংকলক : হযরত ডাঃ মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল (রাঃ), সিভিল সার্জন

অনুবাদ—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(১৩তম কিস্তি)

- তুমি বিনা টিকিটে ভ্রমণ কোর না।
- যে স্টেশনে প্লাটফরমের টিকেট ক্রয় করা আবশ্যক সেখানে তুমি প্লাটফরমের টিকেট না কিনে বা স্টেশন মাষ্টারকে জিজ্ঞেস না করে ভিতরে প্রবেশ কোর না।
- তুমি ভ্রমণে রওয়ানা দেয়ার পূর্বে নিজের সব রকমের মালামালের ওপরে নাম ও ঠিকানা লিখে নাও এবং ওগুলোকে সাবধানতার সাথে গণনা করে নোট বইতে লিখে নাও।
- তুমি স্টেশনে কুলীর নিকট মালামাল বুঝিয়ে দেয়ার পূর্বে তার নম্বর অবশ্যই জেনে নাও।
- হে চাকুরীজীবী! তুমি সরকারী মনোহারী দ্রব্য ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার কোর না।
- তুমি সরকারী কর্মচারী দিয়ে ব্যক্তিগত কাজ করাইও না কেবলমাত্র ঐ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে যে, তুমি তাকে পুরো মজুরী দিয়ে দাও এবং এ শর্তে যে, এ কাজের জন্যে তুমি অনুমতি লাভ করেছো।
- তুমি রেলের নিম্ন শ্রেণীর টিকেট কেটে উপরের শ্রেণীতে ভ্রমণ করো না আর যদি এমন করতেই হয় তাহলে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করো।
- তুমি রেলে-ভ্রমণের সময়ে অতিরিক্ত মালামালের ভাড়া আদায় করো।
- তুমি রেল-ভ্রমণের সময়ে ১২ বছরের অধিক বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্যে পুরো টিকেট কাটো।
- তুমি রেলে-ভ্রমণের সময়ে ৩ বছরের বাচ্চাদের বিনা পয়সায় ভ্রমণ করাবে না।
- তুমি মানুষের সাথে এবং খোদার সাথে আর্থিক লেন-দেনের বিষয় পরিষ্কার রাখো।
- তুমি কখনও বকেয়াদার থাকার প্রবণতা অবলম্বন কোর না।
- তুমি মানুষের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে অঙ্গীকার ও বাধ্য-বাধকতা অবলম্বন করো।
- তুমি মানুষের নিকট থেকে নিজ অধিকার আদায়ের সময়ে খুবই কোমলতা ও অমায়িকতা অবলম্বন করো।

- তুমি তোমার বকেয়া টাকা, দোকান্দারের পাওনা খুব সত্বর বা কমপক্ষে মাসিক ভিত্তিতে আদায় করো।
- তুমি জামাতের চাঁদা নির্ধারিত হার অনুযায়ী ও রীতিমত আদায় করো।
- তুমি ভ্রমণকালীন সময়ে কাউকে বলো না যে, তোমার নিকট কত টাকা আছে এবং
- কোথায় রেখেছো।
- হে মহিলা! তুমি তোমার স্বামীর নিকট তার ক্ষমতার উর্ধ্বে কিছু চাইবে না।
- হে মহিলা! তুমি স্বামীর অর্থ-সম্পদ থেকে শরীয়তের প্রয়োজন ব্যতিরেকে তার ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া খরচ করো না
- তুমি মজুরের মজুরী তার ঘাম শুকানোর পূর্বে নয়তো কমপক্ষে চুক্তি মোতাবেক অবশ্যই আদায় করো।
- তুমি ট্যাক্স, চাঁদাসমূহ, যাকাত ও ওসীয়্যতের অংশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে নিজের সম্পদ ও আয় লুকিও না।

(চলবে)

শুভ বিবাহ

আমার তৃতীয়া মেয়ে সৈয়্যদা আবেদা মনসুরার শুভ বিবাহ বীরগঞ্জ, দিনাজপুর জামাতের প্রবীণ আহমদী মোহাম্মদ ইয়াসিন নূরী (মরহুম) সাহেবের প্রথম পুত্র জনাব আব্দুল কাইয়ুম (রকেট)-এর সাথে ৫০,০০১ (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা দেন মহর ধার্যে ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ইং শুক্রবার বাদ জুমুআ মসজিদ বয়তুল বাসেত, আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহ পড়ান মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, সদর মুরব্বী। এই বিবাহ সকল দিক হইতে বাবরকত এবং আমার মেয়ে জামাই এর দীন ও দুনিয়াবী উন্নতির জন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী। উল্লেখ্য যে, কনে চট্টগ্রাম জামাতের প্রবীণ আহমদী জনাব সৈয়্যদ খাজা আহমদ সাহেবের দৌহীত্রি।

সৈয়্যদ শামসুল হুদা, চট্টগ্রাম

হযরত সাহেবযাদা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব আর দুনিয়াতে নেই!

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পৌত্র ও হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রাঃ)-এর পুত্র হযরত সাহেবযাদা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব, নায়েব আলা ও সদর, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, পাকিস্তান ও আমীর মকামী, রাবওয়া ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে..... রাজেউন)।

হযরত সাহেবযাদা গত কয়েক বছর ধরে হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁকে কয়েকবার আশাতীত ও অলৌকিকভাবে দীর্ঘজীবন দান করা হয়। গত কয়েক মাস ধরে তিনি খুব অসুস্থ ছিলেন। ৪ঠা ডিসেম্বর তাঁকে ফযলে উমর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং ১০ই ডিসেম্বর, '৯৭ সকাল ১০-৫০ মিঃ সময় তিনি তাঁর প্রকৃত প্রভুর নিকট চলে যান। আল্লাহুম্মাগ ফিরলী ওয়ারফাউ দারাজাতাহু। তিনি অর্ধ-শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে জামাতের উচ্চ পদসমূহে থেকে নিষ্ঠার সাথে জামাতের খেদমত করে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের খেদমতসমূহ কবুল করুন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর মজলিসে আমেলা গত ১২-১২-৯৭ তারিখের সভায় মরহুমের রূহের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করেন এবং বাংলাদেশের আহমদীদের পক্ষ থেকে হুযুর (আইঃ)-এর নিকট একটি শোক-প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং পরে যথারীতি তা পাঠানো হয়।

(আহমদী বার্তা)

পত্র-পত্রিকা থেকে

চিন্তা করুন!

(পত্র-পত্রিকা থেকে উপকারী ও হৃদয়গ্রাহী উদ্ধৃতি: জনাব আব্দুস সামী খান, রাবওয়া)

ইঁনি কীভাবে কাফের হতে পারেন?

জনাব আব্দুল হক সাহেব সাপ্তাহিক আল্ ই'তেসাম পত্রিকার জানুয়ারী-২৪ '৯৭ এর সংখ্যায় 'ওলামায়ে ইসলামের নিকট আবেদন' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন:

"কাদিয়ানী টেলিভিশন ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। কুরআন মজীদের তেলাওয়াত ও তফসীর, হাদীসের দরস, হামদ ও না'আত এবং সমগ্র জাতির কাদিয়ানীদের বিশেষ করে আরবীদের নিকট বারে বারে উপস্থাপন করে কাদিয়ানীরা আমাদের নব প্রজন্মের মন-মানসিকতার ওপরে পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এভাবে আমাদের বুযর্গানে কেরামেরা বিগত শতবর্ষের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে নিস্ফল করছে বলে মনে হচ্ছে। **লোকেরা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা শুরু করেছে যে, সাদা দাড়িবিশিষ্ট ও পাগড়ী পরিহিত ব্যক্তি, যিনি সব রকমের ইসলামী ধর্ম-বিশ্বাসের স্বীকৃতি দিচ্ছেন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বারে বারে স্বীয় নেতা বলে ঘোষণা দিচ্ছেন, তাঁর (সাঃ) জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে গিয়ে কেঁদে ফেলছেন, কীভাবে কাফের হতে পারেন"** (সাপ্তাহিক আল্ ই'তেসাম, লাহোর, ২৪-১২-৯৭ তারিখের সংখ্যা)।

আক্ষেপ!

সাইফুল্লাহ্ সোপরা সাহেব নওয়ায়ে ওয়াক্ত, পত্রিকায় 'ভারতীয় প্রচারণার প্রভাবশীল জবাব দেয়া হোক' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেন:

"আমাদের স্যাটেলাইট থেকে উপকৃত হওয়া উচিত। আর নিজেদের ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতা পৃথিবীতে পরিচিত করানো প্রয়োজন। যদি পাকিস্তান একাকী এ কাজ করতে সক্ষম না হয় তাহলে ইসলামী বিশ্বের সাথে একত্রিত হয়ে একটি ইসলামী সেটেলাইট টি, ভি চ্যানেল খোলা উচিত যার মাধ্যমে কাশ্মীর, প্যালেষ্টাইন, বসনিয়া এবং চেচনিয়াতে মুসলমানদের ওপরে সংঘটিত যুলুম অত্যাচারের ঘটনাকে বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করা হোক। ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতার ওপরে ভিত্তি করে প্রোগ্রাম উপস্থাপন করা হোক। ইসলাম ধর্মকে পরিচয় করানো হোক যেন ঐসব লোক যারা ধর্মকে মৌলবাদের ধর্ম বলে আখ্যায়িত করে তারা সঠিক অবস্থা অবহিত হতে পারে।

ইহা বড়ই আক্ষেপের কথা যে, কাদিয়ানী ডিশ দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। তাদের নেতা মির্যা তাহের আহমদ ডিসের মাধ্যমে সারা বিশ্বের কাদিয়ানীদের উদ্দেশ্য করে রীতিমত বক্তৃতা দিচ্ছেন। এ প্রচারণার ইহাই কারণ যে, আমেরিকা ও কতক পাশ্চাত্য দেশে কাদিয়ানীদেরকে সত্যিকারের মুসলমান বলে উপস্থাপন করা হচ্ছে" (নওয়ায়ে ওয়াক্ত, লাহোর, ২-৯-৯৭ বিশেষ সংখ্যা, শেষ পৃষ্ঠা)।

কাদিয়ানী চরিত্র

পাকিস্তানের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর জেনারেল নসরুল্লাহ্ বাবর-এর সাক্ষাৎকার দৈনিক খবর, লাহোর-এ প্রকাশিত হয়েছে। এতে তিনি বলেন:

"একবার মাওলানা চিনিউটি একটি সভায় আসলেন। কথার পর কথা বলে চল্লেন। মাওলানা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সম্বন্ধে শুনেছি যে, আপনি নাকি রীতিমত

(অবশিষ্টাংশ ৪৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

নামাযে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভের ব্যবস্থা

[সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খোৎবা, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭ইং, মসজিদে ফযল, লণ্ডন।]

আল্লাহ্‌তাআলা মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আনন্দলাভের উপকরণ রেখেছেন। অতএব, ইবাদত বা নামাযে আনন্দলাভের ব্যবস্থা থাকবে না কেন, নিশ্চয় আছে।

গত শুক্রবার খুতবা জুমুআর প্রারম্ভে আমি পাকিস্তানে বিরাজমান অবস্থার উপর মন্তব্য করেছিলাম, অনুমান ব্যক্ত করেছিলাম। ঐসকল মন্তব্য মূলতঃ ঈমান ও আত্ম-বিশ্বাসের ভিত্তিতে ছিল। কিন্তু ঐ অনুমানকে বর্ণনা করতে গিয়ে এক হিসেবে ভুল হয়েছে। আমি যা অনুমান করেছিলাম তা আমার বিশ্বাসের একটি অংশ ছিল। পাকিস্তানে যে হারে ফেতনা-ফাসাদ বন্যার পানির মতো বেড়েই চলেছে আর এত বেশী বাড়ছে যে, অবশেষে দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়কেও ডুবিয়ে দিবে বা ডুবাতে যাচ্ছে। সর্বোচ্চ আদালত বলতে সুপ্রীমকোর্ট বুঝাচ্ছি। এ সম্পর্কে আমি অনুমান করেছিলাম, হতে পারে যে, এই বন্যার প্রকোপে দেশের সংবিধানই ভেসে যাবে। এ সংবিধানের মাধ্যমে যুলুম ও অত্যাচারের একটি স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। আক্ষরিকভাবে হয়ত বলেছিলাম না, কিন্তু বিষয়-বস্তু এই ছিল, যার ফলে অনেক আহমদী ধরে নিয়েছিল যে, হয়ত এবার এই সংবিধান বা দেশের আইন যাতে আহমদীদের 'নট মুসলিম' ঘোষণা করে রাখা হয়েছে এবারের বন্যায় তা সম্পূর্ণভাবে ভেসে যাবে। এই অনুমান ভুল প্রমাণিত হলো। আল্লাহ্‌র তকদীর অন্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে। এই সম্পর্কে একটি সংশোধনী দিতে চাচ্ছি তা হয়ত আপাততঃ পূর্ণ হতে না-ও দেখতে পারেন। কিন্তু ভবিষ্যতে অবশ্যই পূর্ণ হতে দেখবেন। আর অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটেছে তা-ও বলছি।

ধারণা করা হয়েছিল যে, সুপ্রীমকোর্ট যে আইন বিষয়ক জটিলতার সম্মুখীন হয়েছে তার যৌক্তিক ফল এই দাঁড়ায় যে, যে আইন আদালতকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে, সেই আইনও এখন বিদায় নিবে। নতুন এমন আইন হবে যার ভিত্তি ন্যায়বিচার এবং তাক্‌ওয়ার উপরে হবে, এমন আশা করা হয়েছিল। এমন ধারণার পেছনে কারণ ছিল দেশের জন্য শুভ-কামনা। **আমি এখনও বিশ্বাস করি, যদি এই আইন, যার সম্পর্কে কথা বলছি এমনই বহাল থাকে কোন পরিবর্তন না করা হয় তবে এই আইন** দেশকে ধ্বংস করে ছাড়বে। যদি এই আইনকে ভেংগে দেয়া হয় তো ভাল, নতুবা এই আইন দেশকে ভেংগে দেবে। অতএব, সর্ব শেষ কথা দেশের মঙ্গল কামনা করা। এর মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যদি আইন থেকে যায়, তবে দেশ ভেংগে যাওয়ার সকল সম্ভাবনা থেকে যাবে। কীভাবে হবে, কবে হবে, তা আল্লাহ্ ভাল জানেন।

আমার ধারণা হয়েছিল যে, সম্ভবতঃ এখনই দেশের সচেতন ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ এতটা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, এই আইন দেশের জন্য কোন মঙ্গল বহন করতে পারে না। এখন ইহা এমন এক আবর্জনায় পরিণত হয়েছে যাকে ছুঁড়ে ফেলা আবশ্যক। এই আইনের সাথে যে যুলুম ও অত্যাচার সংবদ্ধ আছে ঐ যুলুম ও অত্যাচারকেও ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া আবশ্যক যা আহমদীদের সাথে করা হয়ে থাকে। যতবারই এই আইনের পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে প্রতিবারই ন্যায়-বিচারের এই দাবীকে উপেক্ষা করা হয়েছে। অথচ কায়েদে আযম যে আইন চাইতেন তা ন্যায়-বিচার ও তাকওয়ার দাবীকেও পূর্ণ করত। বিষেশতঃ এই আইনে বার বার আহমদীদের মৌলিক অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। **এই কারণে আমি নিশ্চিতভাবে বলছি যে, যদি দেশের আইন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মৌলিক অধিকারকে এই ভাবেই খর্ব করতে থাকে, আর জরুরী পরিবর্তন না করা হয়-তবে এই আইন এই দেশকে শেষ করে ফেলবে।** যেখানে আহমদীদের অধিকারকে হরণ করা হয়েছে সেখানে কোন মানুষের হস্তক্ষেপের কোন প্রশ্ন নেই। এদেশের আইন প্রণয়নকারীদের জন্য আগামীতে এটা একটা পরীক্ষা। তারা আগামীতেও অত্যাচারের এই আইনকে দেশের উপর প্রয়োগ করে রাখবে অথবা ইহাকে পরিবর্তন করবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে এটা সংশোধনযোগ্য কথা এই যে, অনেকে ধারণা করেছিলেন যে, আগামী শুক্রবারের পূর্বে দেশবাসীর বোধোদয় হবে অর্থাৎ আইন বদলে যাবে। কিন্তু এদের দুর্ভাগ্যই বলুন অথবা আল্লাহ্‌র তকদীরের কিছু অজ্ঞাত বা অদৃশ্য বিষয়ই বলুন তা অজানা ছিল। এখন বুঝা যাচ্ছে যে, আরো কিছু সময় বাকী আছে। ঐ অজ্ঞাত বিষয়গুলোর মধ্যে একটি ছিল এই যে, দেশের প্রেসিডেন্ট সাহেব ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। জামাতে ইসলামীর সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। এই কারণে কাযী সাহেব (কাযী হোসেন আহমদ, জামাতে ইসলামীর

আমীর- অনুবাদক) বিনা কারণেই বাড়াবাড়ি করছিলেন। কোন ভোট-ই তার ছিল না, কোন সমর্থনও তার ছিল না। কিন্তু এতটা ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছিলেন যে, আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল সমগ্র দেশের উপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এই ঘটনার পূর্বে তার বক্তব্য ও বিবৃতিতে দেখা যাচ্ছিল যে, আগামীতে হয়ত দুই বছরের জন্য তাকে দেশের প্রধান মন্ত্রী করে দেয়া হবে। করাচীর জনসভায় এবং অন্যান্যস্থানে তিনি যে-সব বিবৃতি ও বক্তব্য রাখছিলেন তার মধ্যে অযথা বালকসুলভ ঔদ্ধত্য পাওয়া যাচ্ছিল যার মধ্যে বিবেক বা যুক্তির কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি এমন এক ব্যক্তি যাকে দেশের মানুষ বার বার প্রত্যাখ্যান করেছে।

বড় বড় দাবীর পরেও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের পরও (যাকে কোন মতে গ্রহণ করা হয় নি।) যার সাথে পূর্বের চেয়েও খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে এবং একজন অযথা আস্ফালনকারী মৌলভীর চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়নি। তাকে দুই বছরের জন্য ক্ষমতায় বসানো হবে কেন? পাঁচ বা দশ বছরের জন্যও তো হতে পারত। অনেকে মনে করেন যে, হয়ত কোন গোপন চুক্তি ছিল প্রেসিডেন্টের সাথে। তিনি গোড়া থেকেই জামাতে ইসলামীর সমর্থন করে আসছিলেন। এটা অসম্ভব ছিল না। তিনি সংসদকে ভেংগে দিতেন। এবং এভাবে একটা অযুহাত এসে যেত প্রেসিডেন্টের হাতে। তিনি বলতেন যে, এই বছরের জন্য আমি দেশকে জামাতে ইসলামীর হাতে তুলে দিচ্ছি। তারপর তাদের ধারণা ছিল যে, জামাতে ইসলামী এমন অবস্থা সৃষ্টি করে নিবে, যার ফলে চিরদিনের জন্য দেশের ক্ষমতা তাদের হাতেই চলে যেত। তবে ইহাও সম্ভব ছিল যে, জামাতে ইসলামীর হাত কেটে দেয়া হত। তাদের জন্য ক্ষমতায় যাবার প্রশ্নই উঠে না। যদি প্রেসিডেন্ট সাহেব চেষ্টা করতেন তবে তার একটি মাত্র উপায় ছিল এই যে, দেশের সেনাবাহিনীর সমর্থন যদি থাকত। তারা এরকম ধারণা করেছিলেন যে, হয়ত সেনাবাহিনী তাদের সমর্থন করবে। সেনাবাহিনীর সাহায্যে বস্তুতঃ জামাতে ইসলামীকে ক্ষমতায় বসানো সম্ভব ছিল। আল্লাহ্‌র অপর অনুগ্রহ যে, এমন বিপ্লব আসেনি যদ্বারা তদনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। আমরা ইহাকে একটি জঘন্য অপচেষ্টা মনে করছি। যদি এমন বিপ্লব এসে যেত এবং দেশের উপর এই দলের কর্তৃত্ব এসে যেত, তবে তা শুধু সেনাবাহিনীর সাহায্যেই হতে পারত। এটাও সত্য যে, যদি সেনাবাহিনী প্রেসিডেন্টের সমর্থনে থাকত তবে প্রেসিডেন্ট ঠিকই জামাতে ইসলামীকে দুই বৎসরের জন্য ক্ষমতায় বসাতেন। অতএব, যে ঘটনার মধ্যে আমরা আমাদের কল্যাণ দেখছি না। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে আসলে তা খুবই ভালই হয়েছে। আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। পাকিস্তানের অবস্থার উপর আমি যে মন্তব্য করলাম দেশের অন্যান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও এমনই মন্তব্য করেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা একটি বড় আপদ থেকে দেশকে রক্ষা করেছেন। আসলে আপদ-বিপদ কিন্তু এখনও বাকী রয়ে গেছে। কারণ আইনের জটিলতা এখনও রয়েই গেছে। অবস্থা কোনদিকে মোড় নিবেন তা আল্লাহতাআলাই ভাল জানেন। কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, আইনের জটিলতা ও সমস্যা এখনও রয়েই গেছে, এখনও সমাধান হয়নি। অনেকগুলো মামলা হয়েছে, অনেকে অপেক্ষায় ছিলেন, তারা চাচ্ছিলেন বর্তমান চীফ জাস্টিসকে সরাবার পদক্ষেপ নেওয়ার পরপরই অন্য একদল জাস্টিসকেও ঐভাবেই বহিষ্কারের পদক্ষেপ নেয়া হবে যারা সুপ্রীমকোর্টে রয়ে গেছেন। এসব ঝগড়া-ফ্যাসাদ পরস্পর বিরোধী। কোটি কোটি টাকা খেয়ে জজ সাহেব মত পরিবর্তন করেছেন-এ ধরনের অভিযোগ ইত্যাদিই পরিবেশকে ভারী করে রেখেছে। পাকিস্তানের বিভৎস চিত্র বাকী পৃথিবীর সামনে তুলে ধরে রেখেছে। **এমন অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে পারে না। এমন এক সমস্যা যার কিছু না কিছু ফলাফল বের হবেই। কোন না কোন বিপ্লব আসতে হবেই। সেই বিপ্লব যদি এই আইনকে ধুয়ে নিয়ে না যায় তবে ঐ কথাই হবে যে, এই আইন এই দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে। এটা অনেক বড় চিন্তার বিষয় যার প্রতি আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দোয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।** অধিকাংশ আহমদীর আর কোন দেশ নেই। এখন অনেক দেশে বড় সংখ্যায় আহমদী হয়ে গেছে-কিন্তু আমার দেশ এবং এমন সব আহমদীদের দেশ যাদের বিরাট বিরাট কুরবানীর ফলে অন্যান্য দেশে আহমদীয়তের প্রসার ঘটেছে। আহমদীদের এই দেশের জন্য-এইসব আহমদীদের জন্য, সকল আহমদীদের জন্য এতটা সমবেদনা হওয়া উচিত এবং এই দেশের জন্য দোয়া করা উচিত। আল্লাহ এই দেশের জন্য ভাল করুন। আইনের পরিবর্তন হোক। দেশ যেন বেদখল হয়ে না যায়। এই দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ আবশ্যক ছিল, আমি এখন পূর্বের বিষয়-নামাযের বিষয়ের বর্ণনা করতে যাচ্ছি।

আমার একেবারেই ধারণা ছিল না যে, নামাযের বিষয়ে খুতবার এত বড় প্রয়োজন ছিল। আমার ধারণা ছিল ২/৩ খুৎবার মাধ্যমেই বিষয়টিকে সমাপ্ত করে দেব। কিন্তু আমি বড় আশ্চর্য হয়েছি এই খুৎবার বিষয়ে যে, অধিক সংখ্যায় আমি পত্র পেয়েছি। ইতোপূর্বে কোন কোন খুৎবা সম্পর্কে কিছু চিঠি আসত কিন্তু এবার শত শত হয়ত বা হাজারে পৌঁছে গেছে চিঠির সংখ্যা। কিন্তু যারা এসব খোৎবার মাধ্যমে আজকাল লাভবান হচ্ছেন তাদের সংখ্যা নিশ্চয় অনেক বেশী হবে। কারণ সবাইতো আর পত্র লিখেন না, সবার লেখার সামর্থ্য হয় না। নিজ বক্তব্য কাগজের উপর লিখার যোগ্যতা অল্প লোকেরই হয়ে থাকে। এ বিষয়ে চিঠি পড়ে বুঝতে পারছি যে, অনেক আগেই এ বিষয়ে খুৎবা দেয়া উচিত ছিল।

শত শত পত্র আসছে। তারা লিখেছেন যে, নামাযের বিষয়ে তাদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অনেকে লিখেছেন যে, আমাদের অতীতের সারা জীবনের নামায হয়ত ব্যর্থ হয়ে গেছে। শত শত ব্যক্তি নিজ হাতে লিখে স্বীকার করেছেন যে, তারা মোটেই নামাযী ছিলেন না। এখন আল্লাহ্‌র দয়ায় তারা এম. টি. এ এর মাধ্যমে খুৎবা শুনে নামায আরম্ভ করেছেন। তারা লিখেছেন যে, খুতবা শুনে তাদের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। এখন নামাযের প্রতি তাদের আগ্রহ সুস্পষ্ট হয়েছে।

যখন বিশ্বব্যাপী জামাত দ্রুত বিস্তার লাভ করে চলেছে তখন এ অবস্থা সৃষ্টি হবার বড়ই প্রয়োজন ছিল। এত দ্রুত জামাতের বিস্তার ঘটেছে যে, এখন মিলিয়নের (দশ লক্ষ) কোঠায় প্রবেশ করেছে প্রতি বছর নতুন বয়াতের সংখ্যা। **এবার নতুন বয়াতের সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষে পৌঁছে যাবার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। আল্লাহ্ ভাল জানেন। বর্তমান অবস্থা দেখে কিছু বলা যায় না। গত বছরের চেয়ে এবার বেশী বয়াতের নিশ্চয়তা দেয়া যায় কিন্ত নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, পঞ্চাশ লক্ষে অবশ্যই পৌঁছাবে।** আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন যে, নবদীক্ষিতদের তরবীয়তের কি পরিমাণ যোগ্যতা আমরা রাখি। কিন্তু আগামীতে জামাতের প্রসারতা লাভের সম্পর্ক আমাদের তরবীয়তে যোগ্যতার সাথে সম্পর্কীত। আমি সব সময় দোয়া করছি যে, আমাদের যোগ্যতার চেয়ে বেশী বয়াত দিও না। সাথে এ দোয়াও ছিল যে, আমাদের সাধ্য ও সামর্থ্য যেন আল্লাহ্ বাড়িয়ে দেন। এখন আমি বুঝিতে পারছি যে, নামাযের খুৎবাগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলা যোগ্যতা বৃদ্ধি করেছেন।

আল্লাহ্‌তাআলা যোগ্যতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। আমরা যদি অনুরূপভাবে নামাযে মনোযোগী হতে থাকি আর ক্লান্ত না হই, তবে সারা পৃথিবীর মানুষকে এই নব-যুগে নিঃসন্দেহে আমরা প্রবেশ করানোর যোগ্যতা লাভ করব। নব দীক্ষিতদের তরবীয়তের যোগ্যতা আমরা লাভ করব। সম্ভবতঃ এভাবে নামাযের বিষয়ে আমি আরো কয়েকটি খুৎবা প্রদান করব। কারণ এবারের নামাযের খুৎবার সুফল এত বেশী যে, ইদানিং কালের অন্য কোন খুৎবার এতবেশী সুফল লাভ হয়নি। যখন মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায় তখন হৃদয়ের অবস্থা বদলে যায়– স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা সিজদায় পড়ে যায়। এর বেশী আর কি চাই?

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন "ইহা দেখে আমার বড় দুঃখ হয় যে, আজকাল ইবাদত, তাকওয়া আর ধর্মনিষ্ঠার প্রতি মানুষের আগ্রহ নেই। তার কারণ এক রকমের রীতির প্রভাব পড়েছে। এই কারণে আল্লাহ্‌র ভালবাসায় ভাটা পড়েছে। এবং ইবাদতে যে ধরনের স্বাদ পাওয়ার কথা ঐ রকম স্বাদ পায় না। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যাতে এক ধরনের স্বাদ আল্লাহ্‌তাআলা না রেখেছেন। যেমন, একজন রোগী খুব স্বাদযুক্ত খাবারেও স্বাদ পায় না। তার কাছে তিতা বা পান্‌সে মনে হয়। অনুরূপভাবে এসব মানুষ যারা ইবাদতে মজা বা স্বাদ পায় না তাদের নিজের অসুস্থ্যতার জন্য চিন্তিত হওয়া উচিত।

এই সেই অনুভূতি যা আজ জাগ্রত হয়েছে। ইতোপূর্বে আমাদের মানুষ অসুস্থ তো ছিল কিন্তু তারা অসুস্থতার কারণে চিন্তিত ছিল না। এই অনুভূতি বা চিন্তা-চেতনার সৃষ্টি হয়নি। নামায সংক্রান্ত বিগত খুৎবাগুলোর মধ্যে বার বার হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর উদ্ধৃতি শোনাবার ফলে ঐ চিন্তা-চেতনা জাগ্রত হয়েছে। রোগী নিজেকে রোগী মনে করতে আরম্ভ করেছে। রোগী যদি নিজেকে সুস্থ মনে করে তবে রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করলেও রোগী বুঝতে পারে না।

রোগ তাকে ভিতরে ভিতরে নিঃশেষ করে দিতে থাকে। কিন্তু এই অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া যে, আমি অসুস্থ এটাই তাকে সুস্বাস্থের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রথম প্রদক্ষেপ। পৃথিবীতে এমন হয় যে, মানুষ রোগ-মুক্তির জন্য পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু আরোগ্য হয় না। অনেক সময় ভাল ডাক্তার পাওয়া যায় না। অনেক সময় চিকিৎসকের মাথায় ভাল ঔষুধের কথা আসে না। অনেক সময় পরিস্থিতি এমন হয় যেমন, দারিদ্রতা বা অন্য কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয়ে যায়। আবার কোন দেশে উন্নতমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে, আবার কোন দেশে নেই। এরকম অনেক বিষয় আছে, যার ফলে রুগীর মনে রোগ-মুক্তির আগ্রহ বা চেতনা জাগ্রত হওয়া সত্ত্বেও রোগ-মুক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু স্বাস্থ্যের ঐ বিধান যা আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের সাথে সম্পৃক্ত-এখানে বড় একটি শুভ সংবাদ এই যে, অসুস্থতার উপলব্ধির নামই স্বাস্থ্য।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর খেদমত জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, আমরা যদি নামাযের মধ্যে মনোযোগের চেষ্টা করি এবং যথেষ্ট মনোযোগ সৃষ্টি করতে না পারি তবে কি আমাদের সারা জীবনের নামায বৃথা যাবে?

একবার হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর খেদমতে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আমরা নামাযের মধ্যে অবিরাম চেষ্টা করেও যদি ব্যর্থ হই তবে কি আমাদের সারাজীবনের নামায ব্যর্থ হয়ে যাবে? হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন 'অবশ্যই নয়'। হুযুর (আঃ) বলেন, **ইহা একটি সংগ্রাম। তোমরা এই সংগ্রাম চালিয়ে যাও। অনেক এমন সংগ্রামী থাকেন যাদের সংগ্রাম বাহ্যতঃ বিফল মনে হয়। আর তারা বিজয়ের মুখ দেখে না, মরতে থাকে, কিন্তু সংগ্রাম করতে থাকে। হুযুর (আঃ) বলেন, তোমরা কি তাদের জীবনকে ব্যর্থ মনে করবে? তারা কি সফল সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেনি। সুতরাং তোমরা চেষ্টা করতে থাক। নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, যদি তোমরা**

সংগ্রাম বা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও, ব্যর্থ হয়ে যেন সংগ্রামে ভাটা না আসে; তবে যখনই মৃত্যু আসবে, তোমার নাম একজন নামাযী হিসাবে লেখা হবে। আল্লাহ্‌র নামে তোমরা নামাযের সংগ্রামে লেগে থাক। এতে যতই বিপদ আসুক না কেন। অনেক সময় মানুষ উপহাস করে যে, এই ব্যক্তির কী হয়েছে! অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর উপর আপত্তি তুলে যে, স্ত্রী সব সময় জায় নামাযে বসে থাকে। একথা সত্য যে, সর্বদা জায়নামাযে বসে থাকা উচিত নয়। স্বামী-সেবার দায়িত্বও পালন করতে হয়। কিন্তু অনেকে এমনই আছেন যে, জায়নামায পসন্দই হয় না। এমন উপহাস-কারীও হতে পারে। পত্রে এসব কথার উল্লেখ থাকে। অনেক সময় শিশু-সন্তানেরা লিখে যে, আমরা নামায আরম্ভ করেছি পিতা-মাতা খুশি হচ্ছে না। কোন কোন স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধে কোন কোন স্ত্রী স্বামী সম্বন্ধে অভিযোগ আনছেন যে, নামাযে মনোযোগী নয়। এক অদ্ভুত জাগরণ এসেছে। সবাই লিখছে আল্লাহ্ সবাইকে তৌফীক দান করুন যেন আমরা সবাই নামাযে যেভাবে মনোযোগী হওয়া উচিত সেভাবে মনোযোগী হতে পারি।

এই যে আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে ইহাই মূলতঃ স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এই আগ্রহ সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ এবং সাফল্যের ইঙ্গিত। যদি এই আগ্রহ জাগ্রত থাকে। আমার দোয়া, আপনারাও আমার সাথে এই দোয়ায় অংশ গ্রহণ করুন যেন এই আগ্রহ থেমে না যায়। হৃদয়ে যে আলোকসম্পাত হয়েছে এই আলো যেন আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করে দেয়। এই আলো যেন না নিবে। আমরা যেন পবিত্র হৃদয় নিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হতে থাকি। যতদিন হৃদয় সম্পূর্ণ আলোকিত না হয় ততদিন যেন ইহা নির্বাপিত না হয়।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) এই দোয়ার দিকে বার বার জামাতকে তাকিদ দিয়েছেন। আমি যেমন বর্ণনা করেছি, আমাদের পা সাফল্যের দিকে বাড়ছে। এই সাফল্যের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষকে সাফল্যমন্ডিত করতে হবে। এই সাফল্যের দ্বারা এই যুগে আহমদীয়তের বিজয়ের ঘোষণা দিতে হবে। অতএব নামাযে রত থাকুন-স্বাদ না পেলেও নামাযে লেগে থাকুন। নিজেকে অসুস্থ মনে করুন এবং রোগ নিরাময়ের প্রতি মনোযোগী হউন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এই রোগের উল্লেখ করে লিখেছেন যে, রোগ মানুষকে অন্যান্য উপকার থেকেও বঞ্চিত করে দেয়। জাগতিক খাদ্য-দ্রব্যের সাথে তুলনা করে উদাহরণস্বরূপ লিখেছেন, দেখ, খাদ্য-শস্য এবং সকল খাদ্য ও পানীয়দ্রব্য মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে-এগুলো থেকে সে কি স্বাদ পায় না? (যা কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে এক ধরনের স্বাদ আছে)। এসব দ্রব্য থেকে স্বাদ নেবার জন্য মানুষের মুখে কি জিহ্‌বা নেই? এই জিহ্‌বা কে দিয়েছেন? আল্লাহ্‌তাআলা। এই জিহ্‌বায় অন্যান্য উপকার ছাড়াও স্বাদ নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জিহ্‌বা ছাড়া কোন কিছুর স্বাদ পাওয়া যায় না। বাইরের প্রকৃতি থেকে স্বাদ নেবার এক ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এই স্বাদ গ্রহণের জন্য শরীরে এক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ যদি খাদ্যের মধ্যে সুস্বাদের গুণাগুণ না থাকত তবুও মানুষ খাবার খেতে বাধ্য ছিল। কিন্তু স্বাদ না থাকলে খাদ্যের জন্য মানুষ এতটা পরিশ্রম করত না।

অধিকাংশ মানুষ খাদ্যের জন্য অনেক পরিশ্রম করে খাদ্যকে সুস্বাদু বানানোর জন্য। যতটা খরচ করে সুস্বাদু করার জন্য গুণগত মান বাড়ানোর জন্য সাধারণতঃ এতটা করে না। জীবন ধারণের জন্য যেখানে পাঁচ টাকার খাদ্যই যথেষ্ট সেখানে ঐ খাদ্য মুখরোচক করার জন্য একশ' টাকা খরচ করে ফেলে। খাদ্যকে মুখরোচক বানাবার জন্য বেশী খরচ করা হয়। জীবন ধারণের ইচ্ছার চেয়ে মজাদার বানাবার ইচ্ছা প্রবল। অথচ অনেক সময় বেশী মজাদার বানাবার প্রবণতা মানুষকে জীবনের আসল উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দূরে নিয়ে যায়। উপরোক্ত বিশ্লেষণকে মসীহ মাওউদ (আঃ) মানব জীবনের বিভিন্ন অবস্থার সাথে তুলনা করে আসল বিষয়কে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। এই বিষয় এখন আলোচনা করছি না। এখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর এই বক্তব্য তুলে ধরছি।

"মানুষ কি এখান থেকে একটা মজার স্বাদ পায় না? সে কি এই সু-স্বাদ পাওয়ার জন্য তার জিহ্‌বার সাহায্য নেয় না? সে কি চমৎকার বস্তু দেখে-গাছ-পালা হোক বা জড়-বস্তু হোক সে কি আনন্দ অনুভব করে না? মধুর সুরের ধ্বনি শুনে সে বা তার কান কি সুখ পায় না? এগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা। কিন্তু খুব কম লোক তা বিবেচনা করে দেখে। একটি সুন্দর দৃশ্য দেখে আমরা কী লাভ করে থাকি? এক প্রকার মজা ও স্বাদ কি লাভ করে থাকি না? এক প্রকার মজা ও স্বাদ লাভ করি। এখান থেকে সুন্দরের অনুভূতি জাগে, এখান থেকে সৌন্দর্যের অনুভূতি জাগে, এখান থেকে সুদৃশ্য ও মনোরম দৃর্শ্যের চেতনা জাগে। এই যে সুন্দরের অনুভূতি এটা আল্লাহ্‌তাআলার সৌন্দর্যের প্রতিফলন। ইহা ঐ স্রষ্টার রূপের বিকাশ যা সৃষ্টির মাঝে প্রস্ফুটিত। আমরা জানি না যে, আমরা কী লাভ করছি। যদি আমরা নিজেদের ঘরে বসে থাকি, কষ্ট করে বড় বড় বোঝা বহন করে পাহাড়ে আরোহণ না করি- তবে আমরা কিছু দেখব না। পাহাড়ে চড়ে আমরা কী দেখি? সুন্দরের সমারোহ দেখি। এই আনন্দ থেকে আমাদের শরীর ও দেহ কী লাভ করে? কিছুই না। শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র মহিমা দেখে আনন্দিত হবার জন্য আমরা বিপদসংকুল অবস্থাকে অবজ্ঞা করে, জীবনকে বিপন্ন করে পাহাড়ে যাই। এই বিষয়কে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এই জন্য বর্ণনা করেছেন যে, সৃষ্টির এই

সমস্ত কর্মকান্ড অযথা নয়। এই সব কিছুর সম্পর্ক অবশেষে সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্যের সাথে রয়েছে। **কিন্তু আল্লাহ্ একথা বলেন যে, আমি মানুষকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি– এখানে কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয় নি তার মধ্যে আনন্দ আর মজা রাখা হয়েছে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন স্বাদ রাখা হয়নি?** ইহা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি যা খন্ডন করা সম্ভব নয়। যদি আল্লাহ্র অস্তিত্ব থেকে থাকে আর নিশ্চয় আছে, এবং মানুষকে তিনি ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন- তবে এটা হতেই পারে না যে, ইবাদতের মধ্যে কোন তৃপ্তি থাকবে না। অথচ তিনি অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে আনন্দ রেখে দিয়েছেন যার দ্বারা মানুষ উন্নতি করে। এই যুক্তির ভিত্তিতে মসীহ মাওউদ (আঃ) আরো বিষয় বর্ণনা করেছেন-যার উপর বিবেচনা করলে আল্লাহ্র অনুগ্রহে ইবাদতের মূল দর্শন বুঝতে পারা সহজ হবে। নামাযে কেন তৃপ্তি পাওয়া যায় না, নামাযে কীভাবে স্বাদ পাওয়া যাবে, বাহ্যত অদ্ভুত লাগবে। এ বিষয়টি বুঝতে পারা সহজ কিন্তু আমল করা সহজ নয়। আমল করে ফললাভ করা অর্থাৎ নামায পড়ে আনন্দ পাওয়ার জন্য বড় পরিশ্রম দরকার হবে। একজন মানুষের বিবেক অবশ্য এ সত্যতার স্বীকার করবে যে, হয়ত এত দ্রুত ঐ পরিশ্রমের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে না পারলেও কমপক্ষে সে নিজে এতটা বুঝতে পারবে যে, এই পরিশ্রম করে নিজের অগ্রগতি ও উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করা উচিত।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন, "খুব ভাল করে বুঝে নাও যে, ইবাদত কোন বোঝা বা ট্যাক্স নয়। এর মধ্যেও এক প্রকার স্বাদ আর তৃপ্তি আছে। আর এই স্বাদ পৃথিবীর সমস্ত স্বাদ– মানবাত্মার অন্য সকল স্বাদের চেয়ে বেশী সুস্বাদু ও উচ্চতর। এ এক অদ্ভুত মন্তব্য যা হযরত আকদস (আঃ) বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের নিকট ইহা সঠিক বলে মনে হবে না। বড় বড় ইবাদতকারী ব্যক্তিত্ব আমরা দেখেছি কিন্তু তারা তো অনেক শক্তি ব্যয় করে ইবাদত করে থাকেন। আর তাদের ইবাদতের পরিধি এতদূর পর্যন্তই যে, তারা বহু জাগতিক প্রয়োজন পূণ করার জন্য ইবাদত করে থাকেন। কেবল মাত্র ইবাদত যদি উদ্দেশ্য হয় তবে এমন নামায অতি অল্প লোকেই লাভ করেছেন।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমন উদাহরণ অনেক পাওয়া যেত, যাঁরা ইবাদতের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। আমরা তাঁদের দেখেছি কীভাবে তাঁরা মসজিদে যেতেন। তাঁদের কথা মনে পড়লে আশ্চর্য লাগে। তখন বুঝতাম না যে, কেন তাদের হৃদয় মসজিদের সাথে আটকে থাকত, গবীর মানুষ, সংসার চালানোর জন্য আয়-উপার্জনে সময় ব্যয় করতে হত অথচ তাঁরা তাঁদের এই মূল্যবান সময় কুরবানী করে খুশীর সাথে মসজিদে যেতেন। কিছু লোক এমন ছিলেন যারা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করতেন, কিছু লোক দুধ-দই বিক্রী করতেন, কেউ বাদাম বেঁচতেন। তাঁদের কেউ তো দোকান বন্ধ করে মসজিদে যেতেন, কেউ খোলা রেখেই চলে যেতেন। তখনকার দিনে আল্লাহ্র ফযলে তাকওয়ার মান উন্নত ছিল। দোকান খোলা থাকলেও কেউ লোভ করতো না। কোন দোকান থেকে কেউ কিছু তুলে নিয়ে যাবে এমন কল্পনাও করা সম্ভব ছিল না। আমি প্রতিদিন দেখতাম- বিভিন্ন সময়ে দেখতাম-স্কুল থেকে আসতে যেতে বিভিন্ন সময়ে দেখতাম। নিশ্চয় তাঁরা নামাযে এমন স্বাদ পেতেন যে, নিজেদের ব্যবসা ফেলে মসজিদে চলে যেতেন। যদি নামাযে তৃপ্তি না পেতেন, তাহলে এভাবে নিজের আয় ছেড়ে নামাযে যেতেন না।

অতএব, এই যে স্বাদ, এ স্বাদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা সৃষ্টি হওয়া আজকেও আবশ্যক। এবং এজন্য পরিশ্রম করা প্রয়োজন। আলহামদুলিল্লাহ্ পরিশ্রম আরম্ভ হয়ে গেছে। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে, নামাযের আনন্দ অন্য সকল প্রকার দৈহিক ও জাগতিক স্বাদের চেয়ে বেশী লোভনীয় এবং উন্নত মানের। এই উন্নত মানের আনন্দ লাভের জন্য অনেক বড় পরিশ্রম করা দরকার। আপনারা ঐ অবস্থার দিকে যাত্রা আরম্ভ করেছেন মাত্র। এটাও আল্লাহ্র বড় কৃপা– যা আমরা লাভ করেছি। এই তৃপ্তি লাভের জন্য চিন্তা করা একান্ত জরুরী। আমরা এ চিন্তাকে বাদ দিতে পারি না।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি যে অসুস্থতার কারণে ভাল ভাল খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত সে প্রাণ-পণ চেষ্টা করতে থাকে স্বাস্থ্য লাভের জন্য। এক ব্যক্তি যদি স্ত্রী সহবাসের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়, তবে সে চিকিৎসকের পেছনে হন্যে হয়ে দৌড়াতে থাকে। আমাদের জানামতে এমন অনেকে ছিলেন যারা স্ত্রী সহবাসের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলায় আত্মহত্যা করেছে।

হযরত ইমাম মাহদী মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে, এই সমস্ত জাগতিক আনন্দ উপভোগ যে উদ্দেশ্যে মানুষকে দেয়া হয়েছিল– সে উদ্দেশ্য অন্য ছিল। কিন্তু মানুষ আনন্দ উপভোগকেই জীবনের আসল উদ্দেশ্য হিসাবে ধরে নিয়েছে। যখন কেউ এমন জাগতিক আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত হয়, তখন তা উদ্ধারের জন্য সব রকম চেষ্টা করতে থাকে। সারা পৃথিবী চষে বেড়ায়। কীভাবে সে ঐ আনন্দ লাভ করবে। কিন্তু এই নামায, যার তৃপ্তি সবচেয়ে বেশী আনন্দদায়ক, তা লাভের জন্য কেউ চেষ্টা করে না। হযরত আকদস (আঃ) বুঝতে পারছেন না যে, কেন মানুষ নামাযের আনন্দ লাভের জন্য সচেষ্ট হয় না। কারণ এই যে, হযরত আকদস (আঃ) বহু উর্দ্ধ লোকের অধিবাসী এত উচ্চস্থান থেকে নিচের দিকে দেখতে গেলে অনেক সময়

অনেক কিছু ভাল করে দেখা যায় না। হযরত আকদস (আঃ) সমস্যা বুঝতে পেরেছেন ঠিকই কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছেন। নামাযের তৃপ্তি অনেক বেশী উপভোগ্য ও উচ্চমার্গের স্বাদ–অথচ মানুষ জাগতিক অন্য আনন্দ লাভের জন্য এত বেশী আগ্রহ রাখে ও পরিশ্রম করে পোকামাকড়ের মত নিজেকে নষ্ট করছে। কিন্তু নামাযের তৃপ্তি যা প্রকৃত ও শাশ্বত সত্য তা লাভের জন্য কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। হযরত আকদস (আঃ) বলছেন, হাঁ, ঠিক এমনই সে একজন হতভাগ্য মানুষ –যে আল্লাহ্‌র ইবাদতের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পায় না। হযরত আকদস (আঃ) এদের হতভাগ্য বলে নিজের মনের ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। আর সঠিক দিক-নির্দেশনাও দিয়েছেন-যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইবাদতে আনন্দ পায় না সে আসলেও হতভাগ্য।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আরো একটি অতি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিষয় উল্লেখ করেছেন এই যে, বান্দা ও আল্লাহ্‌র মধ্যে যে সম্পর্ক যে বন্ধন, তার স্বাদ তো সকল প্রকার দৈহিক মিলনের সুখের চেয়ে বেশী সুখের। সাধারণ মানুষ হযরত আকদস (আঃ)-এর কথা বুঝতে পারে নি। অনেক এই তত্ত্ব বুঝতে না পেরে বড় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। অনেকের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী মধুর মিলন হচ্ছে নারী পুরুষের দৈহিক মিলন। এমন কি অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্যের চেয়েও অধিক আনন্দদায়ক। মানুষ সবচেয়ে বেশী এই দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকে। ফ্রয়েড এই তথ্যকে ভিত্তি করে একটি মানসিক চিকিৎসা শাস্ত্রের ভিত্তি রেখেছিলেন। আমি নিজে ফ্রয়েডের সাথে ভিন্নমত পোষণ করি। আজকাল অন্য বিজ্ঞানীরাও দ্বিমত পোষণ করছেন। কিন্তু ফ্রয়েড একটি কথা ঠিক বুঝেছিলেন, এই যে **নারী পুরুষের যৌন সম্পর্ক বড় একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। পৃথিবীর সকল উপভোগ্য বিষয় গুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ না হলেও অন্যতম একটি সম্পর্ক। হযরত মাহদী (আঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যের সম্পর্কটাও নারী পুরুষের দৈহিক মিলনের মতই মধুর সম্পর্ক। একজন মোটাবুদ্ধির মানুষ এটা বুঝতে পারবে না। এখানে আমাদের বুঝতে চেষ্টা করতে হবে যে, ইবাদতের সাথে এই সম্পর্ককে কীভাবে তুলনা করা যেতে পারে।** হযরত আকদস (আঃ) বলছেন যে, সকল প্রকার স্বাদ তো একই প্রকৃতির-একই ধরনের অনুভূতি। যে কোন উপায় যে কোন স্বাদ পাওয়া যায়– সব স্বাদই একই প্রকার। সকল প্রকার স্বাদের অর্থ এই যে, নিজ কামনা বা বাসনার পূর্ণতার নাম স্বাদ বা তৃপ্তি। যে কোন রকম চাহিদা পূর্ণ হওয়া বা উদ্দেশ্য সফল হওয়ার নাম তৃপ্তি। যদি আপনি আপনার চাহিদা পূরণ করতে পারেন বা উদ্দেশ্য লাভে সফল হন তবে তৃপ্তি পাবেন। আর কিছু কাল পরে আপনার উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে শুধু উপলব্ধি বাকী থেকে যাবে। এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা দর্শন যার উপর হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) সমগ্র মুসলিম উম্মার সকল উলামায়ে কেরামের চেয়ে বেশী স্পষ্ট আলোকপাত করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর যুগের পরে আজ পর্যন্ত কেউ এ বিষয়ে এত সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করেনি।

এই মহামূল্যবান উপহার অনেকের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে– কিন্তু যারা মুর্খ ছিল তারা অবজ্ঞাভরে অহংকারের সাথে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই মহাসত্য থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। জামাতে আহমদীয়ার মানুষকে এই মহান সত্য উপলব্ধি করতে হবে-গ্রহণ করতে হবে। প্রারম্ভে অদ্ভুত মনে হবে। কিন্তু ইহা অতি সত্য যে, সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বেশী উপভোগ্য ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ উপলব্ধি ইহাই। পৃথিবীতে বসবাসের উপায় ও উপকরণ যদি তৃপ্তিদায়ক হয় স্বাদযুক্ত হয় তবে ইহারই অপর নাম পার্থিব স্বাদ বা জৈবিক স্বাদ। মানুষ পৃথিবীতে যেভাবে বা যদ্বারা সবচেয়ে বেশী পার্থিব আনন্দ উপভোগ করে–(নারী পুরুষের মিলন) তারই মাধ্যমে সে পৃথিবীতে স্থায়ীত্ব লাভ করে (সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে সে বেঁচে থাকে)। আল্লাহ্‌তাআলা এই উদ্দেশ্যেই মানুষকে এই আনন্দের উপকরণ দান করেছেন যে, সে এর মাধ্যমে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার উপায় করে নেয়। অর্থাৎ প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে

হযরত আকদস (আঃ) বলছেন যে, আল্লাহ্‌তাআলা যদি এই কর্মে এই ধরনের আকর্ষণ বা আনন্দ না রাখতেন তবে কোন মানুষ এই কর্মের কথা চিন্তাও করত না। নারী-পুরুষ কেন অযথা এমন বাজে কর্মে লিপ্ত হতে যাবে? এমন পাগল কে হতে পারে? একে অপরকে জুতো মারতে চাইত যে, এমন খারাপ কাজ কেন করবে সে? নারী-পুরুষের মিলনের এই ক্রিয়া যদি আনন্দদায়ক না হত তবে কেউ এমন কর্ম করত না। এভাবে পৃথিবীতে বংশ-বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যেত। হযরত আকদস (আঃ) বলছেন যে, এই আনন্দ প্রকৃতপক্ষে 'বাকা' বা স্থায়ীত্ব লাভের আনন্দ। স্থায়ীত লাভের উদ্দেশ্যে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে তৃপ্তি রাখা হয়েছে। কিন্তু মানুষ আসল উদ্দেশ্যকে ভুলে গিয়ে শুধু আনন্দটাকেই উদ্দেশ্য মনে করেছে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণ এই যে, নারী-পুরুষের দৈহিক মিলন মূলতঃ চিরজীবী হবার আনন্দ। এখানে হযরত আকদস (আঃ) বলছেন, **আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার মিলনও বান্দাকে চিরজীবী করার উদ্দেশ্যে। এমন চিরস্থায়ী জীবন পার্থিব জীবনে যার তুলনা হয় না। যেমন আকাশের সাথে পাতালের তুলনা করা যায় না।**

আল্লাহ্ ও বান্দার এ মিলন মানুষ চিন্তা করলে আশ্চর্য হবে যে, আল্লাহ্ ও বান্দার মিলনকে নারী-পুরুষের মিলনের সাথে কীভাবে তুলনা করা যেতে পারে। এখানে বলা হয়েছে– সাধারণ মানুষ এই তুলনা বা উপমাকে বুঝতে

পারবে না। হযরত আকদস (আঃ) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, নারী-পুরুষের মিলনের আসল আনন্দ স্থায়ীত্ব লাভের আনন্দ-চিরজীবী হবার আনন্দ। যদি চিরস্থায়ী জীবন লাভের আনন্দকে বাদ দেয়া হয় তবে অবশেষে একসময় দেখবে ঐ শরীরও বিলুপ্ত হয়েছে যদ্বারা স্বাদ গ্রহণ করা হয়। আজকের যুগে ইহার একটি প্রমাণ আমরা দেখছি সমকামিতার আকারে। ধীরে ধীরে সমকামীরা বিলুপ্ত হচ্ছে। এমন এমন রোগগ্রস্থ হচ্ছে যা মানব জাতিকে ধ্বংস করে যাচ্ছে। এই রোগের কোন প্রতিশেধক নেই। আগামী বছরগুলো বলবে যে, এই রোগ কীভাবে মানব প্রজন্মকে ধ্বংস করছে। যেভাবে হযরত লূত (আঃ)-এর জাতিকে এক কালে ধ্বংস করেছিল।

একটা হচ্ছে উদ্দেশ্য, আর একটা হচ্ছে উদ্দেশ্যকে সামনে রাখা। উদ্দেশ্যকে সামনে রাখা সম্পর্কে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মূখ্য উদ্দেশ্যকে বাতিল করে সে নিজে বাতিল হয়ে যায়।' আনন্দ উপভোগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে আসল উদ্দেশ্যকে লাভ করার জন্য। যদি কেউ উদ্দেশ্যকে ভুলে গিয়ে শুধু আনন্দ উপভোগ করে, তবে তাকে বলা হবে 'পার্থিব জীবন' বা জাগতিক জীবন যাপনকারী। আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদিগকে নিজের সাথে মিলানের জন্য-তোমাদের স্থায়ীত্বকে তাঁর সাথে মিলনের শর্তে সংযুক্ত করে দিয়েছেন। **যদি তোমরা 'রব্ব্' বা প্রভুর বান্দা হও আর তোমাদের মিলন হয় তাঁর সাথে অর্থাৎ উপাসক ও উপাস্য প্রভুর মধ্যে মিলন হয়-তবে এই মিলন যত সুদৃঢ় ও গাঢ় হবে, মিলনের আনন্দ ততবেশী মধুর হবে পৃথিবীর অন্য সকল আনন্দ উহার তুলনায় তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন হবে।**

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বিষয়টিকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। হতভাগ্য কিছু লোক হযরত আকদসের (আঃ) এই পবিত্র বর্ণনার মাহাত্ম্যকে বুঝতে না পেরে তাঁকে (আঃ) উপহাস করেছে। তারা বলেছে, হযরত (আঃ) নাকি বলেছেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র সাথে এমন সম্পর্ক রাখেন যেমন নারী-পুরুষের সম্পর্ক (নাউযুবিল্লাহ্)। তাদের মুর্খতার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে এর বেশী কিছ বুঝবার যোগ্যতাই ছিল না- এদের মধ্যে আধ্যাত্মিক আকাশে উড্ডয়নের যোগ্যতা তো নাই-ই, এমন কি তারা একটি লাফও দিতে পারে না। তারা নিজেরা পোকা-মাকড়ের মত ময়লা ও মাটি ভক্ষণ করে আর ওলী-আল্লাহ প্রিয়, পবিত্র বান্দাদের সম্পর্কে অ-পবিত্র ধারণা পোষণ করে। সুতরাং এদের কথা ভুলে যান। এদের বেদনাদায়ক মন্তব্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। **আপনারা সেই ঐশী পবিত্র বিষয়কে ধারণ করুন যা হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ) আমাদিগকে দিয়েছেন। উহার সংগে দৃঢ়ভাবে নিজকে সংযুক্ত করুন। আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার সম্পর্ক। বান্দার জন্য অমর জীবনের উপায় পার্থিব জীবনকে স্থায়ীত্ব দানকারী সম্পর্ক যদি আনন্দদায়ক হয় তবে পবিত্র অমর জীবনের উপায় আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক অবশ্যই আনন্দদায়ক হওয়া উচিত। যদি আপনি (এই প্রক্রিয়ায়) আনন্দ না পান তবে নিজের অবস্থার জন্য চিন্তিত হোন। নিশ্চয় আপনি অসুস্থ।** এই অসুস্থতার প্রতি হযরত আকদস (আঃ) বার বার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই প্রসংগে বলেছেন,

"স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের বন্ধন তো অস্থায়ী ও পরিত্যজ্য।" স্ত্রী-পুরুষের জোড়া যদি আমাদের দৃষ্টিতে অতি সুন্দর এবং উত্তম হয়ে থাকে তবে এ সম্পর্ক বড় মধুর হতে পারে। হযরত আকদস (আঃ) বলছেন, "স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক অস্থায়ী। **আমি বলছি, মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে যে সম্পর্ক-বন্ধন সে বন্ধন প্রকৃত সত্য ও চিরস্থায়ী এবং প্রকৃত অর্থে বড় মধুর এ বন্ধন।** আমি বড় কষ্ট ও অস্বস্তি বোধ করি- কখনও কখনও ইহা আমার জন্য হৃদয় - বিদারক হয়ে দাঁড়ায়।

দেখুন, কত মহাসত্য হযরত আকদস (আঃ) বর্ণনা করছেন। ইহা অতি সত্য কথা, সামান্যতম অতিরঞ্জন নয়। মানুষ যদি একদিন খাবার খেয়ে তৃপ্তি না পায় চিকিৎসকের কাছে দৌড়ে যায় কত চেষ্টা করে, টাকা-পয়সা খরচ করে- কষ্ট করে কোন মতে যেন সে সুস্থ হয় এবং ভাল খাবারের স্বাদ উপভোগ করতে পারে।

এমনই সেই অযোগ্য পুরুষ যে স্ত্রী সহবাসের আনন্দ উপভোগ করতে ব্যর্থ হয়-কোন কোন সময় অনুতাপের কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। অনেক সময় এরকম মৃত্যুর ঘটনা ঘটে যায়। হায় আফসোস! ঐ রোগীর জন্য, যে মানসিক রোগী, হৃদয় যার রোগাক্রান্ত -সে কেন চেষ্টা করে না- যে ইবাদতে স্বাদ পায় না।

হযরত আকদস (আঃ) জাগতিক বিষয়ের উদাহরণ দিয়েছেন অথচ জাগতিক উদাহরণ দিয়ে আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং পার্থিব বিষয়কে **আধ্যাত্মিক বিষয়ের সাথে সমন্বয় করে দিয়েছেন। আধ্যাত্মিক রোগগ্রস্ত হৃদয় কেন রোগমুক্তির চেষ্টা করে না। ব্যথায় তার প্রাণ কেন ভারাক্রান্ত হয়ে যায় না। মানুষ পার্থিব আনন্দ উপভোগের জন্য কি না করে। কতবড় হতভাগ্য সে, যে পার্থিব অস্থায়ী জীবনের আনন্দ উপভোগের জন্য রোগমুক্তির চেষ্টা করে এবং পেয়েও যায়। কিন্তু ইহা কি করে হতে পারে যে, ঐশী-জীবনের জন্য তথা চিরস্থায়ী জীবনের জন্য চিকিৎসা সম্ভব হবে না।' চিকিৎসা আছে, অবশ্যই আছে। তবে, উহা খুঁজতে হলে ধীর বিরামহীন প্রচেষ্টা, দৃঢ় ও অবিচল পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন আছে।**

ইহা কত বড় সত্য ও মহান বিষয়-হুযূর (আঃ) বলেছেন, যে আনন্দ পাচ্ছে না সে তা পাবার জন্য প্রচেষ্টা চালায় এবং পেয়েও যায়। যদি এই চেষ্টা সফল না হত তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এবং চিকিৎসকদের পরামর্শের কোন

মূল্য থাকত না। সবাই না পেলেও অনেকেই স্বাস্থ্য উদ্ধারের চেষ্টায় সাফল্য লাভ করে ও আনন্দ উপভোগের যোগ্যতা লাভ করে। এই কারণে অনেক ডাক্তারের চিকিৎসার খুব সুনাম হয়। অনেক সময় এ ধরনের চিঠি আমি পেয়ে থাকি। আজকেও এমন একটি চিঠি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। একজন হিন্দু ক্যানাডা থেকে এসেছেন। তার স্ত্রী অসুস্থ। অনেক চিকিৎসায় কোন ফল হয় নি। শেষে একজন আহমদী তাকে বলেছে যে, হযরত সাহেব এমন রোগের সফল চিকিৎসা করেছেন। তাই শুনে ঐ ভদ্রলোক স্বপরিবারে চলে এসেছেন। তিনি লিখেছেন যে, আমি তাকে সময় না দিলেও কোন অভিযোগ করবে না। তবে অনুগ্রহ করে যদি দেখি তবে সে কৃতজ্ঞ হবে কারণ তিনি আর কোন উপায় দেখছেন না।

দেখুন কি অবস্থা! মানুষ রোগমুক্তির জন্য কত কষ্ট করে কতজনের দ্বারস্থ হয়। কেউ একজন বলেছে অমনি সে এসে হাজির। এমন অনেক চিকিৎসকও আছেন যারা মূলতঃ ভাল চিকিৎসক নন। কিন্তু নিজের কৃত্রিম সুনাম রটিয়ে টাকা উপার্জন করছেন। কখনও হঠাৎ কোন রোগী তার ঔষধে ভাল হয়েছে। আর তিনি বিজ্ঞাপন প্রচার করে খুব সুনাম অর্জন করেছেন। অনেকে ঐ প্রচারের কারণে তার চিকিৎসা গ্রহণ করে টাকা-পয়সা নষ্ট করছে।

কিন্তু নামাযের ঐশী আনন্দের খাতিরে কে এমন দূরের যাত্রা করছে? পার্থিব প্রচেষ্টায় অনেক সময় সাফল্য হয়ে থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিক চিরস্থায়ী জীবন এবং স্থায়ী আনন্দ লাভের জন্য আল্লাহ্‌তাআলা চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখেন নি এমন হতে পারে না। অবশ্যই আধ্যাত্মিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রেখেছেন। তবে উহার অনুসন্ধানের জন্য দৃঢ় ধীর ও অবিচল পদক্ষেপ দরকার। 'পৌইয়া কদম' এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হযরত আকদস (আঃ) ব্যবহার করেছেন। এমন ধীর ও সুস্থির ও দৃঢ় পদক্ষেপ যাতে কখনও ক্লান্তি আসে না। যারা ঘোড়ায় চড়েন তারা জানেন যে, ঘোড়া যদি 'পৌইয়া কদমে' চলতে আরম্ভ করে তবে সারা দিনেও ক্লান্ত হয় না, দ্রুত দৌড়ালে বা চললে ক্লান্ত হবে। কিন্তু ধীর গতিতে সমান তালে দৃঢ়তার সাথে অবিচল অবিরাম চলতে হবে। এই শব্দ ব্যবহার করে হযরত আকদস (সাঃ) অনেকগুলো উপদেশ দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছিলেন, পুণ্য কাজে পরিশ্রম কর। কিন্তু হঠাৎ এতবেশী পরিশ্রম কর না যে, শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড় এবং শরীর ভেংগে পড়ে। পরিশ্রম করতে থাক-বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে পরিশ্রম করতে থাক। অবশেষে যাত্রা শেষ এবং সাফল্য লাভ করবে।

অতএব, ধীর চলার কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, নামায বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে এ উদ্দেশ্যে সফল হওয়া সম্ভব হবে না। **সারা জীবনের বিষয়-দু'চার দিনের কথা নয়। দ্রুত দৌড়ে, লাগামহীনভাবে দৌড়ে, আপনি যদি মনে করেন যে, থাবা মেরে মেরে নামাযে সাফল্য লাভ করবেন, তা হবে না। এতে ব্যর্থতা আসবে আরো বেশী নিরাশ হবেন। হতাশায় ভুগবেন।**

সুতরাং, আজ আপনারা যারা এই অধ্যায়ে প্রবেশ করেছেন তাদের উপদেশ দিচ্ছি, **আপনারা অস্থিরতায় ভুগবেন না। এমন মনে করবেন না যে, সপ্তাহ পার হয়ে গেল, দশদিন পার হয়ে গেল, মাস পার হয়ে গেল, এখনও নামাযে স্বাদ পাচ্ছি না। যদি এমন অস্থিরতা থাকে তবে আপনার দৃঢ়তা স্থায়ী হবে না। ধীর গতি বিরামহীন গতি ব্যতীত দৃঢ়তা লাভ হয় না। সকালে, দিনে, রাতে চলতে থাকুন।** স্মরণ রাখুন যে, আপনি প্রতিনিয়ত গন্তব্যস্থলের নিকটবর্তী হচ্ছেন। যে কোন সময় গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারেন। যদি আপনি স্থীরতা ও নম্রতা প্রদর্শন করতে পারেন তবে আল্লাহ্‌র ফযলে মহান সাফল্য দেখবেন।

নিয়ম এই যে, প্রত্যেক নামাযে কিছু কিছু বিষয়ে মনোনিবেশ করুন। ছোটদের ক্লাসে, উর্দূ ক্লাসে বলেছিলাম-উর্দূ ক্লাসে অনেক কথা বিভিন্নভাবে ছোটদের বুঝাবার চেষ্টা করি। অনেকে লিখেছেন যে, তারা সবিশেষ উপকৃত হচ্ছেন। ছোটদের যে বুঝাতে চেষ্টা করি তার ফলে বড়রাও বুঝে নেন। "মোটা বাচ্চা" "বড় বাচ্চা" সবাই আনন্দ পায়। বড় বাচ্চা ঘানার ইসমাঈল আডো সাহেব। আমি আশা করি আপনারা সবাই বুঝে নিবেন। **প্রতি নামাযে কিছু কিছু বিষয়ে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করুন। সকল বিষয়ে একই নামাযে মনোনিবেশ সম্ভব হবে না। এমন চেষ্টা করলে আপনি শীঘ্র ভেংগে পড়বেন। প্রতি নামাযে কোন একটি দিক নির্বাচন করে রাখুন। ঐ নামাযে অমুক দিকটায় মনোনিবেশের চেষ্টা করুন। যেমন ধরুন, আল্‌হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন-এর উপর মনোযোগ দিন।** ছোট বালকও মনোযোগ দিতে পারবে যে, 'রব্বুল আলামীনের' মধ্যে মানুষের খাদ্য সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা রয়েছে। আমি যখন তাদের খাদ্যের উদাহরণ দিয়েছি তাদের মুখে হাসি ফুটেছে-তাদের আনন্দ লেগেছে যে, রব্বুল আলামীন কথায় মানুষের খাদ্যের কথা আছে। সবাই বুঝেছে। অতএব, আপনারও বুঝতে পারবেন।

আমি আশা করছি আপনারা এই উপদেশটিকে খুব স্মরণ রাখবেন। বাকী ইনশাল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করব।

(ওডিও ক্যাসেট থেকে সরাসরি অনূদিত) অনুবাদ ঃ **মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, সদর মুরব্বী**

বিঃ দ্রঃ যেহেতু এখন থেকে পাক্ষিকে ২টি করে খুৎবা যাচ্ছে তাই প্রত্যেক জামাতে আলাদাভাবে যে খুৎবা পাঠানো হতো তা আর পাঠানো হবে না। হুযূর (আঃ)-এর খুৎবা যাতে সকলে শুনে এবং পাঠ করে সে জন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ও রিপোর্ট পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে। - ন্যাশনাল আমীর

(৩৬ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

নামায পড়েন: আমি উত্তর দিলাম "হ্যাঁ"। পরে বল্লেন, 'আপনি তেলাওয়াত করেন'? আমি বল্লাম, 'হ্যাঁ'। মাওলানা চিনিউটি বল্লেন, 'তাহলে মনে হয় আপনি কাদিয়ানী'।

আমি মাওলানাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মাওলানা, আপনি কি ইমামতি করেন'? মাওলানা বল্লেন, 'হ্যাঁ'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি তাহাজ্জুদ পড়েন'? মাওলানা বল্লেন, 'হ্যাঁ'। আমি বল্লাম, 'তাহলে পরে আপনি তো কাদিয়ানী হওয়ার অধিক দাবীদার'।

(দৈনিক খবর, লাহোর ৫-৯-৯৭ বিশেষ সংখ্যা, ১ম পৃষ্ঠা)

খোদা কার সাথে

হায়দরাবাদ নিবাসী আবুবকর বালুচ করাচী থেকে প্রকাশিত মাসিক দিফা' পত্রিকায় 'ত্রিশ লাখ আফরাদ কা কুফর লাহমা ফিকরইয়াহ" শীর্ষক বিষয়ে লিখেন,

"কয়েকদিন পূর্বে আমার কতিপয় কাদিয়ানী বন্ধুর সাথে (যারা নিজেদের আহমদী বলে থাকেন) স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তাদের ইমাম মির্যা তাদের আহমদ এর খুতবা দেখার সুযোগ হলো..... .....কাদিয়ানীদের সংখ্যালঘিষ্ঠ অমুসলমান করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান হয়নি। কাদিয়ানীদের হত্যা করা বৈধ করে দেয়া হয়েছে কিন্তু এতেও সমাধান হয়নি। হত্যার মিথ্যা ভীতিপূর্ণ নাটক হয়েছে। কিন্তু নিষ্ফল। এখন সব রকমের চেষ্টা-প্রচেষ্টার পরে ইহা সামনে এসে গেছে যে, কাদিয়ানী জামাতের নেতা বড়ই গর্বের সাথে ঘোষণা করেন যে, এক বছরে ৩০ লক্ষ লোক কোন জামাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিশ্ব-চোখ এর পূর্বে এ দৃশ্য দেখে নি ··**কাদিয়ানীদের দিন দিন উন্নতি, লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় লোক কাদিয়ানী ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ** (আসলে ধর্মের নাম ইসলামই —অনুবাদক) **আর বিশ্বকে কাদিয়ানীয়ত-এর প্রতি আকৃষ্ট করানো বাহ্যতঃ এই কথার নিদর্শন বলে মনে হয় যে, খোদাতা'আলা তাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান"**—

(মাসিক দিফা' করাচী, আগষ্ট '৯৭ পৃষ্ঠা ৩০ ; ১ম খণ্ড সংখ্যা ৩)

ইহুদী খৃষ্টানের মত!

মাসিক কওমী ডাইজেষ্ট লিখেছে—

"আকায়ে নামদার রসূলে করীম (সাঃ) একবার ভবিষ্যদ্বাণীও করেন যা হাদীসের আকারে মজুদ আছে যে, 'মুসলমান শেষ পর্যন্ত ইহুদী-খৃষ্টানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা আরম্ভ করবে এবং ইহুদী খৃষ্টানরা যে কাজ করেছে মুসলমানরাও ঐ কাজই করবে'। এক হাদীসের শব্দগুলো এমন—'তোমরাও শেষ পর্যন্ত বিগত উম্মতের ভঙ্গিতে চলতে থাকবে। এমন কি যদি তারা কোন গর্তে প্রবেশ করে থাকে তাহলে তোমরাও প্রবেশ করবে;—ইহুদী-খৃষ্টানই কি উদ্দেশ্য? তখন তিনি জবাবে বল্লেন, 'আর কারা' (রসায়েল ও মাসায়েল প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩)?

বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনি চিন্তা করলে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন যে, মুসলমানদের অধিকাংশ কাজ-কর্মই ইহুদী-খৃষ্টানদের মত বরং এতদ্দ্বারা গর্বও করা হয়ে থাকে।

(মাসিক কওমী ডাইজেষ্ট, লাহোর, সংখ্যা-৯৪, পৃষ্ঠা-৭৫)

যদি মুসলমান ইহুদী খৃষ্টানদের মত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাদের সংশোধনের জন্যে একজন মসীহের সত্তা অর্থাৎ মসীলে মসীহের আগমনে আশ্চর্য হবার কী আছে! যেভাবে রসূলে খোদা (সাঃ) নাসারতীয় মসীহ্ আলায়হেস সালামের সদৃশ হওয়ার কারণে 'মসীহ্' নাম প্রদান করেছেন"।

(১২-১২-৯৭ তারিখের আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল থেকে সংগৃহীত ও অনূদিত: সাহেবুল কাহাফ)

কোন্‌টি সত্য ?

১। বায়তুল মুকার্‌রম মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক বলেন :

"তাদের কথিত মসজিদের ওপরে ডিশ এন্টিনা স্থাপন করে যুবকদের অশ্লীল ছবি দেখাচ্ছে"

(দৈনিক ইনকিলাব, ১৮/৯/৯৩ ইং)।

২। সাংবাদিক জনাব খ, আ, ম, রশিদুল ইসলাম প্রদত্ত প্রতিবেদনের হেডিং

"ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় কাদিয়ানীদের ক্ষমাহীন ধৃষ্টতা"

মসজিদে টিভি সেট, ডিসএন্টিনা স্থাপন

অশ্লীল ও নীল ছবি প্রদর্শন

৩ কলামব্যাপী বিরাট মসজিদের ছবির নিচের ক্যাপশন :

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : ভণ্ড নবীর ঘৃণ্য দাবীদার কাদিয়ানী ফেরকাবাজদের সব কিছুতেই ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র। হালে পবিত্র এবাদতগাহ মসজিদকেও কাদিয়ানীরা আমেদ-প্রমোদের আস্তানা ও লীলা ক্ষেত্ররূপে রূপান্তরের কাজে লিপ্ত হয়েছে। ওপরের ছবিতে তারুয়ার 'মসজিদে বাশারতে' কাদিয়ানীদের স্থাপিত ডিশ এন্টেনার দৃশ্য—ইনকিলাব।

খবরের সারাংশ—"ডিশ এন্টিনার বদৌলতে এ মসজিদের টি ভি সেটে প্রতিদিন অশ্লীল ব্লু ফিল্ম প্রদর্শনের মাধ্যমে এবাদতের পরিবর্তে চলছে বেহায়াপনা ও ইসলাম বিরোধী ঘৃণ্যতর কার্যকলাপ"

(দৈনিক ইনকিলাব, ৮/১০/৯৩ ইং)।

৩। সাম্প্রতিক কালে সাংবাদিক গোলাম মওলা মুরাদ প্রদত্ত প্রতিবেদনের হেডিং—

"কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা"

স্যাটেলাইট চ্যানেলে কাদিয়ানীদের

ইসলাম বিরোধী মারাত্মক প্রচারণা

প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ :

"গোলাম মওলা মুরাদ : বিশ্বের দেশে দেশে 'অমুসলিম' ঘোষিত 'কাদিয়ানী'রা গ্লোবাল ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রবেশ করে মূল ঈমানী চেতনার বিরুদ্ধে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। ডিশের মাধ্যমে স্যাটেলাইটে দিন রাত ২৪ ঘণ্টার বিরতিহীন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা প্রচার করছে। তথ্য মিড়িয়ার এই যুগে মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যমকে পুঁজি করে প্রতিনিয়ত ইসলামের মূল বিশ্বাসের পরিপন্থী গুরুতর প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে যাচ্ছে তারা। সারা বিশ্বে তো বটেই দেশের রাজধানী ঢাকা চট্টগ্রাম সহ গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোকে কেন্দ্র করে তারা ডিশের সংযোগের মাধ্যমে অপপ্রচারে নেমেছে।

মূলত পাশ্চাত্য ও ইহুদী অর্থ সাহায্যে লালিত কাদিয়ানীরা সুকৌশলে মিডিয়া আগ্রাসনের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের সরলপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তির বীজ বুনছে। বৃটিশ অর্থও

কারিগরি সাহায্যে তারা এমটিএ বা 'মুসলেম টিভি আহমদীয়া' ইন্টারন্যাশনাল নামে স্বতন্ত্র স্যাটেলাইট প্যানেল চালু করেছে। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাসকে ধ্বংস করার এত শক্তিশালী নেট ওয়ার্ক আর নেই।

এমটিএ চ্যানেলের বিভিন্ন সময়ের অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, এখানে দিনভর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কুরআন-হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা দেয়া হয়। মূলত প্রচার করা হয় 'হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সকল নবী থেকে শ্রেষ্ঠ হলেও শেষ নবী নন। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত নবী মুহাম্মদ-এর উম্মত 'মসীহ মাওউদ' বা প্রতিশ্রুত সংস্কারক মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীই হলো মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতিচ্ছায়া, যার মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন।

বিভিন্ন গানের সুরের মত করে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় এই চ্যানেলে। যেটা ইসলামে নিষিদ্ধ। কুরআনের তাফসীরের নামে বিভিন্ন আয়াতের ইচ্ছামাফিক অপব্যাখ্যা করা হয়। এমটিএ'তে যারা এসব অনুষ্ঠান পরিচালনা করছে, তাদের দেখলে মনে হয় এদের চেয়ে খাঁটি মুসলমান আর নেই। পূর্বে এরা ফ্রেন্সকাট দাঁড়ি রাখলেও বর্তমানে হুবহু মুসলমানদের মত করে পুরো মুখ ভর্তি দাড়ি রাখে। এমটিএ'র পুরো অনুষ্ঠান প্রস্তুত, প্রচার, যোগাযোগসহ সকল বিষয়ে কলকাঠি নাড়া হয় কমোভিলাইজেশন করা হয় ইংল্যাণ্ড থেকে। এতে 'ধারণকৃত' এবং 'সরাসরি সম্প্রচার' এই দু'ধরনের অনুষ্ঠানই প্রচারিত হয়। এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে কাদিয়ানীদের বর্তমান 'গুরু' খলিফাতুল মসীহ-৪-এর খুতবা, প্রশ্নোত্তর, শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠান, ডকুমেন্টারী, কুরআনের আয়াত এবং হাদীসের কাদিয়ানী মতে ব্যাখ্যা ও অন্যান্যের সাথে তুলনামূলক আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে 'খাতামাল খুলাফা' আখ্যা দিয়ে 'নাত' পেশ প্রভৃতি।

দীর্ঘদিন থেকে কাদিয়ানীরা ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে আসছে। ১০৮ বছর পূর্বে ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ তৎকালীন বৃটিশ শাসনামলে পাঞ্জাব প্রদেশের লুধিয়ানা শহরে 'আহমদীয়া মুসলিম জামাত' নাম দিয়ে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সূচনা করেন মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানেরা ছিল তৎপর।

মুসলমানদের ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং ইসলামী আকিদা নস্যাৎ করার লক্ষ্যে বৃটিশরাই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে কাদিয়ানীদের সৃষ্টি করে। তাদের সাহায্যে এযাবৎ কাদিয়ানীরা ১০৬টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা সম্বলিত অনুবাদ প্রকাশ করেছে। ১৭টি ভাষায় ৭৯টি পত্রিকা প্রকাশ করছে। দেশে দেশে তাদের সিলসিলা মোতাবেক তৈরী করা হয়েছে ৬০০০ মসজিদ। ১৫৬টি দেশে ইসলামের ভ্রান্তিমূলক প্রচারের লক্ষ্যে স্থাপিত হয়েছে ১১০০০ 'আহ-মদীয়া জামাত'। পাকিস্তান এবং আরব রাষ্ট্রগুলোতে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা হলেও বাংলাদেশে এ ব্যাপারে এখনো কোন উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। বৃটিশ অর্থ ও কারিগরি সহায়তায় ১৯৯৪ সালের ৭ই জানুয়ারী কাদিয়ানীরা 'এমটিএ' নামে স্বতন্ত্র চ্যানেল সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের প্রতিটি স্থানে এ ক্যাবল নেটওয়ার্কে দেখা যায় এমটিএ'র অনুষ্ঠান। ডিশের বর্তমান অবস্থান ৫৭ ডিগ্রী ইষ্ট ও ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সি ১০৯০ ও ৯৭৫-এর মধ্যে। অডিও

ফ্রিকোয়েন্সি ৬ দশমিক ৫০০ মেগাহার্টসে এসব অনুষ্ঠান শোনা যায়। ৭টি অডিও চ্যানেলে একযোগে সাত ভাষায় প্রচার হয় অনুষ্ঠান। এগুলো হলো বাংলা, ইংরেজী আরবী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইন্দোনেশিয়ান ও তুর্কী। বাংলায় শোনা যায় ৭ দশমিক ৩৮ মেগাহার্টসে। সন্ধ্যার পর বাংলা অনুষ্ঠান চলে।

প্রকৃত পক্ষে কাদিয়ানীদের প্রকাশ্যে এ ধরনের সুগভীর ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে প্রকৃত মুসলমানরা একেবারেই বেখবর। (দৈনিক সংগ্রাম, ১২/১২/১৯৯৭ ইং)

আমাদের বক্তব্য—লা' নাতুল্লাহি আলাল কাযিবীন (মিথ্যাবাদীদের ওপরে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত)। সাহেবুল কাহফ

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ)

আমরা এ ব্যাপারে আমাদের খলীফা সাহেবের মুবাহালার চ্যালেঞ্জ স্মরণ করিয়ে দিয়ে লা'নাতুল্লাহি আলাল কাযেবীন (মিথ্যাবাদীদের ওপরে আল্লাহ অভিসম্পাত) পাঠ করছি। সাহস থাকলে আপনিও এ লা'নত পাঠ করুন এবং আপনার অভিযোগের সত্যায়নে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করুন।

প্রতিবেদক সাহেব আহমদীয়া জামাত কর্তৃক একশ' ছয়টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের তফসীর প্রকাশের কথা উল্লেখ করে উহাকে কুরআন হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা আখ্যায়িত করে নিজ দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। তারতো উচিত ১০৬ ভাষায় কুরআনের তফসীর প্রকাশ করে আহমদী জামাতের ভুলগুলো ও মিথ্যা প্রচারণাগুলো ধরিয়ে দেয়া ও শুধরিয়ে দেয়া। আমরা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি, তা তিনি বা তার দল কোন দিনই করবেন না বা করতে সক্ষম হবেন না। আচ্ছা প্রতিবেদক সাহেব! আপনি এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারবেন কি যে, আপনাদের গুরুজী যে তরজমা ও তফসীর প্রকাশ করেছেন তা মুসলিম উম্মাহ্‌র সকলেই একবাক্যে পরম ও যথার্থ তফসীর বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন বা খোদ বাংলাদেশেই সকলের নিকট তা সমাদৃত হয়েছে অথবা এমন কোন তফসীর সম্বন্ধে কি আপনার জানা আছে, যে তফসীরের কোন প্রকার বিরোধিতা হয় নি, তা সর্বজনমান্য? আর যদি যুক্তির খাতিরে ধরেও নেয়া হয় যে, অমুকের তফসীর সর্বজনগৃহীত তাহলে এর পরে যেসব তফসীর লেখা হয়েছে বা ভবিষ্যতে লেখা হবে সেগুলো কি অযথা কাজ বলে ঘোষণা দিতে পারবেন?

প্রতিবেদক নিজেই স্বীকার করেছেন যে, আহমদীয়া জামাত বিশ্বের ১৫৬টি দেশে ১১০০০ জামাতে বিস্তৃতি লাভ করেছে ১০৮ বছর সময় ধরে। আর এ কথাও সত্য যে, বিরুদ্ধবাদীরা তাদের বিরোধিতায় কোন প্রকার কসুর করেন নি গত এক শতাব্দী ধরে। তাই প্রতিবেদক সহ সকল বিরুদ্ধবাদীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি, আর কালক্ষেপণ না করে আমাদের জামাত কর্তৃক প্রকাশিত তফসীরগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। আর এমটি এর চ্যানেলের খবর তো পেয়েই গেছেন—অহোরাত্র প্রচারিত এ চ্যানেল থেকে প্রকৃত ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে যে অনুষ্ঠানগুলো প্রচারিত হয় সেগুলো দেখুন এবং বুঝতে চেষ্টা করুন। আল্লাহ্‌তা'লা সকলকে সত্য লাভ করার সৌভাগ্য দান করুন।

সম্পাদকীয়

মাহে রমযান আস্‌সালাম

আর কয়েকদিন পরেই শুরু হতে যাচ্ছে মাহে রমযান—পবিত্র সাধনার মাস। মু'মিনের আধ্যাত্মিক কাননে ঘটবে নব-বসন্তের সমারোহ। আনন্দে হিল্লোলিত হবে তার হৃদয়-ভুবন। সাধক-মধুকরেরা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে আহরণ করতে থাকবে আধ্যাত্মিক পুষ্প-রস। সঞ্চিত করতে থাকবে সারা বছরের জন্যে জীবন-বারি। আমরা মাহে রমযানকে জানাই স্বাগতম—আস্‌সালাম।

মাহে রমযান আসে আমাদের জন্যে বাড়তি কতক ইবাদত বন্দেগীর সুযোগ নিয়ে। রমযানের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো সঠিকভাবে সম্পাদনে মু'মিন পুরস্কার পাবে সরাসরি আল্লাহ্‌-তাআ'লার নিকট থেকে বা স্বয়ং তাঁকেই। রোযা বাদে অন্য কোন ইবাদতের পুরস্কার আল্লাহ্‌ স্বয়ং হবেন—এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি কোথাও।

রমযানের রোযা রাখার সাথে সাথে কুরআন তেলাওয়াত—পারলে কমপক্ষে পুরো কুরআন মজীদ এক বার পাঠ শেষ করা বাঞ্ছনীয় এবং এর দরসের ব্যবস্থা করতে হবে ও শুনতে হবে। তারাবীহ, তাহাজ্জুদ প্রভৃতি নফল নামাযের মাধ্যমে করতে হবে রাতগুলোকে জাগ্রত। রোযার আর এক কাম্য হলো দীন-দুঃখীদের অভাব উপলব্ধি করা। এ লক্ষ্যে আর্থিক কুরবানীকে সতেজ করতে হবে। নবী করীম (সাঃ) রমযান মাসে ঝড়ের গতিতে দান-সদকা-খয়রাত করতেন। আমাদের তাই লাযেমী চাঁদাগুলো আদায়ের সাথে সাথে **যাকাত, ফিদিয়া, ফিতরানা** (এবার ফিতরানা ধার্য করা হয়েছে জনপ্রতি ৩২-০০ টাকা এবং ফিদিয়া : শহরের জন্যে জনপ্রতি ৬০০/- টাকা এবং গ্রামের জন্যে ৪৫০/- টাকা) এবং **তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের** চাঁদা প্রভৃতি আদায় করতে হবে। আল্লাহ্‌-তা'আলা আমাদের সকলকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

ধর্মের ঢাক আপনি বাজে

গত ১২ই ডিসেম্বর '৯৭ তারিখের দৈনিক সংগ্রামে জনৈক প্রতিবেদক গোলাম মাওলা মুরাদের 'সাটেলাইটে কাদিয়ানীদের ইসলাম বিরোধী মারাত্মক প্রচারণা' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রতিবেদক যদিও আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সাটেলাইট নেট ওয়ার্ককে ইসলাম বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছেন তথাপি তিনি অবলীলায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্ব-ব্যাপী ইসলাম প্রচারের একটি সঠিক অথচ সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেছেন। আমরা এজন্যে প্রতিবেদককে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

প্রতিবেদক সাহেব অজান্তেই হোক আর হিংসার দহনেই হোক আহমদী জামাতের এ মিডিয়া কর্ম-কাণ্ডকে 'পাশ্চাত্য ও ইহুদী অর্থ সাহায্যে লালিত' আখ্যায়িত করেছেন।

(অবশিষ্টাংশ ৪৮ পাতায় দেখুন)

12th Issue 31st December, 1997

Fortnightly THE AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

MUSLIM TV AHMADIYYA INTERNATIONAL

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	: 6.50 MHz
* English	: 7.02 MHz
* Arabic	: 7.20 MHz
* Bangla	: 7.38 MHz
* French	: 7.56 MHz
* German	: 7.74 MHz
* Indonesian	: 7.92 MHz
* Turkee	: 8.1C MHz

- এমটিএ MTA আন্তর্জাতিক স্যাটালাইট টেলিভিশন সর্বক্ষণ খাঁটি ইসলাম প্রচারে রত একমাত্র টিভি চ্যানেল।
- সারা বিশ্বে এই চ্যানেল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানাদি প্রচার করে থাকে।
- এমটিএ একমাত্র টিভি নেটওয়ার্ক যাতে মূল অডিও চ্যানেলসহ মোট ৮টি ভাষায় অডিও চ্যানেল বিদ্যমান।
- বর্তমানে এই চ্যানেল দৈনিক এক ঘন্টা বাংলাদেশের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চার বার বাংলায় বিশ্ব সংবাদ প্রচার করে চলেছে।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মে: হা:।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272